কেবলই

সুমন্ত আসলাম

SUPERIOR SUNY

BOILOVERS.COM

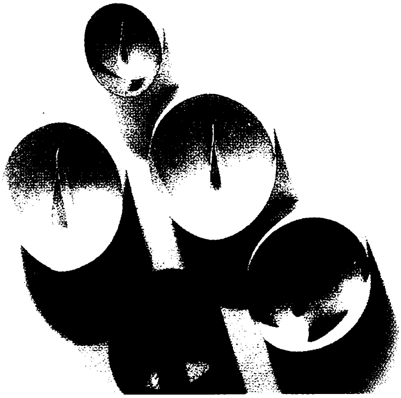

পাঁচ বছর আগে সুমন্তর একটা বই বের হয়েছিল—গল্পের বই এবং তার প্রথম বই। সেই প্রথম বই 'স্বপ্নবেড়ি' দিয়ে প্রায় সবাইকে চমকে দিয়েছিল সুমন্ত। নানা স্বাদের গল্পে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রায় সবাই। পাঁচ বছর পর আরেকটা গল্পের বই বের হলো সুমন্তর। সেই আগের মতোই গল্প নিয়ে—নানা স্বাদের, নানা ধরনের। কোনো কোনো গল্প আমাদের খুব কাছের কাহিনী নিয়ে, কোনো কোনো গল্প একটু পাশ্চাত্যের গল্পের মতো, কোনো কোনোটা আবার একেবারেই অন্যরকম!

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে—প্রতিটা গল্পেই একটা অন্য মাত্রার আকর্ষণ রয়েছে, যা শেষ মুহূর্তে চমকে দেবে আপনাকে।

সুতরাং চমকলাগা এ গল্পের জগতে প্রবেশ করার জন্য আপনাকে আন্তরিক আমন্ত্রণ। কী, আসবেন তো!

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

কেবলই

সুমন্ত আসলাম

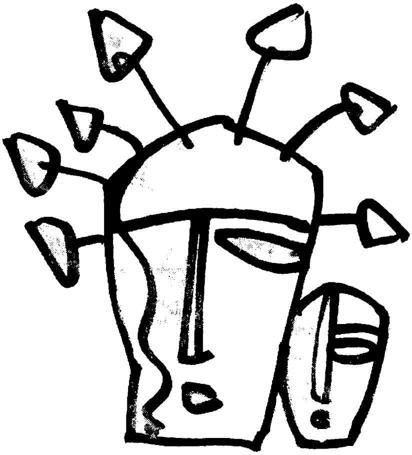

পার্ল পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল
একুশে বইমেলা ২০০৬

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

ISBN-984-495-152-6

পার্ল পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে হাসান জায়েদী কর্তৃক প্রকাশিত এবং সালমানী মুদ্রণ সংস্থা, নয়াবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষরবিন্যাসে ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক
৪০/৪১ আহাম্মদ কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ৮০.০০ টাকা

Keboli, by Sumanta Aslam, Published by Hassan Zaidi, Pearl Publications, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100. Date of Publication February 2006. Price : 80 Tk. Only

কয়েক বছর আগেও আমরা অনেকেই তাদের বাসায় যেতাম, আড্ডা দিতাম, হরেক রকম গল্প করতাম, মজার মজার খাবার খেতাম। এখনো সময় পেলে তাদের বাসায় যাই, আড্ডা দিই, গল্প করি, এটা-ওটা খাই, মজা করেই খাই। সময়ে কত কী বদলায়—আকাশের রং বদলায়, গাছের পাতা বদলায়, নদীর পানি বদলায়, মানুষও বদলায়। কেবল বদলালেন না আপনারা।

প্রিয় হাফিজুর রহমান, প্রিয় হাফিজ ভাই। প্রিয় পাপড়ি রহমান, প্রিয় পাপড়ি আপা।

সব মানুষ আন্তরিক হতে পারে না, আপনারা পেরেছেন। তাই তো শত ব্যস্ততার মাঝেও কোনো এক অলস মুহূর্তে আপনাদের কথা ভাবি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি—হায়, আবার যদি সে রকম আড্ডা দিতে পারতাম, যেতে পারতাম আপনাদের কাছাকাছি!

সহজ হওয়ার মধ্যেই আছে কালচারের পরিচয়, আড়ম্বরের মধ্যে আছে দম্ভ। সে দম্ভ কখনো অর্থের, কখনো বিদ্যার, কখনো-বা প্রতিপত্তির।

-**যাযাবর**

সূচি

পণ্য ১১
পেট ১৮
আয়না ২৫
যন্ত্র ৩৫
দ্বন্দ্ব ৪৩
একটি এক পাওয়ালা কাক এবং আমি ৪৬
বর্ণচোরা ৫৩
সাপ ৫৮
মৃত্যুসংকেত ৬২
যে কথা বলা যায় না ৭১
রবাহূত ৭৬
কেবলই ৮২

পণ্য

বছরে তিনবার আমাদের বাড়িতে মাংস রান্না হয়। দুই ঈদে দুবার, আর একবার বিশেষ একটা দিনে। সে দিনটি হলো, বড়'পাকে দেখতে আসার দিন। সেদিন আমাদের বাড়িতে মাংস আসে মূলত অতিথিদের জন্য। কপাল ভালো হলে, অবশেষে ওই দুর্লভ বস্তুর উপস্থিতি ভাতের থালাকে করে ধন্য এবং আমাদের দু চোখকে করে সার্থক। তলায় পড়ে থাকা ঝোল নামক গাঢ় তরল পদার্থের সঙ্গে ভাতের মাখামাখি গলাধঃকরণ করে সেদিন আমরা পরিতৃপ্তির সশব্দ ঢেঁকুর তুলি, আর মনে মনে বলি—আলহামদুলিল্লাহ।

বড়'পাকে আজ দেখতে আসবে। আটবার হয়ে গেছে, আজ নিয়ে নয়বার হবে। প্রতিবারই সবশেষে কালো মুখ করে বাবা ফিসফিস করে মায়ের সঙ্গে কী যেন বলেন, মা চোখের জলে আঁচল ভেজায়। বড়'পা উদাস হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে মুগ্ধ চোখে। বিলু আর মিলু তাদের পরনের একমাত্র নতুন জামাটা খুলে টিনের বাক্সটিতে পরম যত্নে ভাঁজ করে রেখে দেয়। আমি বেড়ানোর নাম করে রাত দশটা পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি।

স্বভাবতই আজ আমাদের বাড়িতে মাংস রান্না হবে। আর মাংস পেতে হলে অবশ্যই বাজারে যেতে হবে। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলা কিংবা হালচাষে বলদ, যেটাই হোক, বাজার করবে সংসারের বেকার ছেলে। সারা রাতের সুখস্বপ্ন নিয়ে ঘুম কাটিয়ে সকালে উঠেই দুঃস্বপ্ন শুরু হয়ে যায়। বাজারের টাকা এবং তার চেয়েও বেশি ওজনের ফর্দ এনে প্রতিদিন মায়ের একই কথা—বাজারে যা, বাবা। আমি কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় সময় কাটিয়ে অবশেষে বোধহীনভাবে বাজারে যাই। চর্বিওয়ালা মানুষের চর্বিযুক্ত মাছ কেনা দেখে দেখে নীরবে ঢোক গিলি। টাকাই সব, ধনী না হলে আর নয়—এ জাতীয় আপ্তবাক্য জানিয়ে হৃদয়কে আপাত শান্ত করে বাজার করতে থাকি। সব মিলিয়ে যা কিছু একটা কিনে নিয়ে বাড়ি আসি, পরম যত্নে মা ওগুলো দেখতে থাকে। কোনো কিছু বাদ পড়লেই তার গগনবিদারী চিৎকার। তাই শুনে বাবা প্রায়ই বলেন, 'চিৎকার করে কী করবে, রাবুর মা! এখন তাও কিছু পাচ্ছ। মানুষ এখন মানিব্যাগে টাকা নিয়ে বাজারের ব্যাগে বাজার নিয়ে আসে। কিন্তু

সেদিন আর দেরি নেই, রাবুর মা, মানুষ বাজারের ব্যাগে টাকা নিয়ে মানিব্যাগে বাজার করে আনবে।'

বাবার এই অদ্ভুত কথা শুনে আমি প্রায়ই হেসে ফেলি আর নরকের সংজ্ঞা খুঁজতে থাকি বাজার করা থেকে।

বসে বসে চিন্তা করছি। অদ্ভুত সব চিন্তা। চিন্তার সূত্রতায় নিজেকে কখনো কখনো দার্শনিক মনে হয়। বেশ ভালো লাগে তখন। সুখ-দুঃখের অদ্ভুত মিশ্রণে সুখী-দুঃখী ভাবটা কেমন ভালো লাগা আবেশ জাগায়। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে মা ছুটে এসে বলে, 'এখনো বসে আছিস, বাজারে যাবি কখন? বাজার আসবে তারপর রান্না। আর শোন, গতবারের মাংসটা ভালো ছিল না, কেমন যেন আঁশ-আঁশ।'

আমি অবাক বিস্ময়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। মা তার চেয়েও অধিক অবাক হয়ে বলে, 'ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে কী দেখছিস?'

হেসে হেসে আমি বলি, 'গতবারের মাংসের স্বাদ তোমার এখনো মনে আছে?'

মা একটু লজ্জা পেল বোধ হয়। মুখটা নিচু করে ফেলে। আমি মাথা চুলকানোর ভাব করে প্রসঙ্গ বদলিয়ে মাকে বলি, 'এই অল্প টাকায় এত কিছু আনব কীভাবে?'

'আমি কী জানি, তোর বাবা যা দিয়েছে তা-ই তোকে দিলাম।'

'আরো কিছু টাকা হলে ভালো হতো।'

'আমি টাকা পাব কোথায়? আর ভালো লাগে না রে, মরার সংসার টানতে টানতে শেষ হয়ে গেলাম।'

মায়ের কান্নার শব্দ শুনতে শুনতে আমি বাজারে যাই। অদ্ভুত এক স্বপ্নিল মন নিয়ে আমি পথ চলতে থাকি। মাঝে মাঝে ভীষণ রাগ হয় বাবার ওপর। তখন বাবাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অকর্মার দলে স্থান দিয়ে ফেলি। বাবাটা যে কী না! কাস্টমের চাকরিটা করলে কী হতো? কিন্তু তিনি তা করবেন না, কারণ অসৎ জায়গায় নাকি সৎ থাকা যায় না। বিভিন্ন অসততা দেখে দেখে নাকি লোভী মনটা জেগে উঠতে চায়। যাকে বলে অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ। এ প্রসঙ্গ এলেই বাবা বলেন, 'বড় ঘৃণা লাগে রে, বড় ঘৃণা।'

বাবার এক বন্ধু আছেন, আকবর চাচা। বাবার সঙ্গেই কাস্টমে ঢুকেছিলেন। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। লাল টকটকে চকচকে গাড়ি। তিনি যখন গাড়ি থেকে বের হন, তার আভিজাত্য দেখে মনে হয়, স্বর্গ থেকে আসা এক দেবদূত। ঘরে বসেই বিভিন্ন আলাপ প্রসঙ্গে বলেন, 'মতিন, তুই সেই আগের মতোই রয়ে গেলি, একটু চেঞ্জ-মেঞ্জ হলে ক্ষতি কী?'

বাবা ম্লান হেসে বলেন, 'আকবর, তুই কি সুখী, বল—তুই সুখী?' বাবা তার নিজের বুকের মাঝখানে হাত দিয়ে বলেন, 'এই যে এখানে, ঠিক এখানে,

এখান থেকে যে সুখ বের হয় সেটাই আসল সুখ। সে বিচারে আমি কিন্তু সুখী রে, আকবর।'

আকবার চাচা মাথা নিচু করে চলে যান। আমাদের বাড়ির সামনে থেকে ভোঁস করে গাড়িটা যখন বেরিয়ে যায়, তখন বাবার সাইকেল চালিয়ে স্কুল মাস্টারি করতে যাওয়াটাকে মিলিয়ে দেখি। তফাৎটা বড় বিস্তর।

পিংকির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আমাদের বাড়িতেই। আকবর চাচা একদিন তার মেয়েকে নিয়ে এসে মাকে বললেন, 'ভাবি, ও তো মায়ের আদর পেল না, ঘর-সংসার কী তাও জানে না, ওকে আপনি একটু বুঝিয়ে দেবেন।' সেবার পিংকি আমাদের বাড়িতে তিন দিন ছিল। একদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছিল আর ভাবছিল। আমি পেছনে দাঁড়িয়ে ওকে দেখি। ওর ঘাড়ের হালকা রোমগুলো কী বিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে আছে। ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল ওইখানটায় একটু হাত রাখি। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম—হতভাগা, এ পরশপাথর তোর নয়, কোনো দিন হওয়ারও নয়। দু সপ্তাহ পর পিংকির বিয়ের দাওয়াত পেয়েছিলাম আমরা। অব্যক্ত এক কষ্ট নিয়ে সেদিন আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি।

বাজার করে ফিরেই দেখি বাবা বারান্দায় পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই তিনি দৌড়ে এসে বলেন, 'পিন্টু, বাইরের ঘরের দেয়ালঘড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে রে। একবার যা-না, সারাতে পারিস কি না। দেয়ালে ঘড়ি ঝুলানো আছে, কিন্তু তা চলে না, বড্ড বিশ্রী লাগে রে।'

আমাদের এই দেয়ালঘড়িটা অনেক দিনের পুরনো। ঘড়িটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, আবার হঠাৎ চলতে শুরু করে। চুপচাপ বন্ধ থেকে আবার ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে চলতে শুরু করে। যেন মধ্যবিত্তের অহঙ্কার জানান দিতে চায়, এই আমি বেঁচে আছি। বাবাকে বলি, 'ওটা এমনি চালু হবে, বাবা।'

বাবা কী বুঝে চলে যান। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাশের বাসার নতুন বিল্ডিংটা দেখি; ষোড়শীর মতো সেটি ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। তারই ছায়া পড়েছে আমাদের উঠোনে। বিলু হঠাৎ দৌড়ে এসে বলে, 'ভাইয়া, মিলু ভাইয়াটা বলে কী, আমরা নাকি গরিব!' আমি বলি, 'দূর পাগলি, আমরা হলাম রাজা।'

বিলু ফিক করে হেসে ফেলে। বলে, 'রাজারা তো প্রতিদিনি পোলাও-মাংস খায়।'

'কেন, আমরাও খাব।'

খাবার কথা শুনে বিলু যেন একটু থমকাল, 'আমাদের আজ মাংস দিয়ে ভাত, তাই না ভাইয়া। কতদিন পর আমরা মাংস খাব!'

চোখে জল এসে যায় আমার। এই হতভাগা চোখের শুধু পানি ঝরানোই সার। মনে মনে ভাবি, চোখ দুটো আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিই। কিন্তু মায়া,

এই প্রকৃতির মায়ায় তা আর করা হয় না। সংশোধনী হাসি হেসে আমি ওকে বলি, 'নতুন জামা পরেছিস?'

'নতুন কোথায়, ভাইয়া, এ তো গত ঈদের। তুলে তুলে পরি তো, তাই নতুন লাগছে।'

দুপুরের একটু আগে পাশের বাড়ির ভাবী এলেন। এই মানুষটিকে দেখলে পৃথিবীর সবকিছু ভালোবাসতে ইচ্ছে করে আমার। প্রতিবারই ভাবীর কাজ হচ্ছে, বড়'পাকে তার সর্বোচ্চ মেধা দিয়ে সাজানো। এ অলিখিত দায়িত্বটা ভাবী একাই কাঁধে নিয়েছেন। একটা মানুষ যে কত মধুর হতে পারে, তা এই ভাবীকে না দেখলে বোঝা যেত না।

ভাবীর সবকিছুই সুন্দর। তার অসম্ভব ফর্সা মুখে ঠোঁটের ওপরের কালো আবছা রোমগুলো তাকে আরো সুন্দর করে তুলেছে। আমি প্রায়ই বলি, 'আপনার গোঁফগুলো খুব সুন্দর, ভাবী।' ভাবী মিষ্টি হেসে বলেন, 'আর কিছু সুন্দর না?'

'হ্যাঁ, আপনার সব সুন্দর। আপনার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমার সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছে করে।'

'সন্ন্যাসী হলে সংসার করবে কে?'

'সংসার—সেটা আবার কী জিনিস, ভাবী? একা বেঁচে থাকতেই মরে যাচ্ছি।'

'চাকরি-বাকরি কিছু হচ্ছে?'

'হবে। রাজনীতিবিদদের জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মতো আমি আপনাকে বলতে পারি, চাকরি হবে, তবে...।'

'তবে?'

'কবে হবে জানি না, ভাবী।'

মা একটা ইস্ত্রি করা শাড়ি পরেছে। একটু পরেই ওরা আসবে। গোসল সেরে মা তার ভেজা চুল পিঠে ছড়িয়ে দিয়েছে। দেবী দেবী লাগছে মাকে। মা সাধারণত কোনো দিনই তেমন সাজে না। বড়'পাকে একবার দেখতে এসে ছেলের মা কাজের মেয়ে মনে করে মাকে বলেছিল, 'এই মেয়ে, এক গ্লাস পানি দাও তো।' মলিনবেশী মা সেদিন চুপচাপ এক গ্লাস পানি এনে দিয়েছিল তাকে। এরপর থেকে মা অন্তত চেষ্টা করে তার মলিনতা দূর করতে। খোঁপা বাঁধে, মুখে সামান্য পাউডার মাখে। কিন্তু সাদা পাউডার মায়ের মুখে ফাঙ্গাসের মতো ভেসে থাকে।

বাবা একটু পর প্রায় দৌড়ে এসে বলেন, 'পিন্টু, একটু এগিয়ে যাবি?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বলি, 'কোথায়?'

'ওরা তো এখনো আসছে না।'

'বাবা, আপনি এত ভাবছেন কেন, সময় হলেই ওরা এসে পড়বে।'

‘তবু একটু যা না।’ তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘কি রে দাড়ি কাটিসনি? আয়নায় মুখটা একবার দেখ, কী বিশ্রী লাগছে।’

আমি হেসে বলি, ‘আয়না কোথায় পাব, বাবা। আয়নাটা তো ভাঙা। ভাঙা আয়নায় মুখ দেখতে আমার ভালো লাগে না, বাবা।’

বাবা মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যান। আমি ভেতরের ঘরে যাই। ভাবী খুব সুন্দর করে সাজিয়েছেন বড়’পাকে। আমি মুগ্ধ চোখে বড়’পাকে বললাম, ‘আপা, তোকে একটা কথা বলি।’

আপা মুখ তুলে তাকায়।

‘তোকে আজ খুব সুন্দর লাগছে রে, আপা।’

ভাবী হঠাৎ বললেন, ‘ও কবে অসুন্দর ছিল?’

‘কিন্তু ভাবী, এত সুন্দর হয়েও... ।’ আমি কথাটা শেষ করি না। বড়’পা মাথা নিচু করে ফেলে। ভাবী ম্লান মুখে বলেন, ‘সবই কপাল।’

ভাবীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আমার দীর্ঘশ্বাস মিলিয়ে যায়।

আপার পাশে বসে বিলু নিজে নিজেই সাজছে। ফাঁকে দাঁড়িয়ে মিলু অনেকক্ষণ ধরে মাথা আঁচড়াচ্ছে। ভাঙা আয়নাটা এপাশ-ওপাশ করে মুখ দেখছে। আমার বেশ হাসি পায়। নানা কায়দায় ওর মাথা আঁচড়ানো দেখে আমি অনুধাবন করি—ও যুবক হচ্ছে।

মা পেছন থেকে এসে আমাকে বলে, ‘তোর বাবা অস্থির হয়ে পড়েছে।’

‘কেন?’

‘ওরা এখনো আসছে না।’

‘তুমি তো আবার ঘড়ি দেখা জানো না, তাহলে বলতাম ঘড়ি দেখো। এখন মোটে ১টা বেজে ২৭ মিনিট। ভদ্রলোকেরা সাধারণত সময়ের চেয়ে অসময়েই বেশি আসেন। ও নিয়ে বাবাকে চিন্তা করতে নিষেধ করো। ওরা এসে পড়বে।’

মা মুখ কালো করে চলে যায়। ভাঙা আয়নাটায় আমি আমার খোঁচা খোঁচা দাড়িমাখা মুখটা দেখে সামান্য সন্তোষ বোধ করি। এই বেশ ভালো থাকা, বেঁচে থাকা। দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।

মিলু কখন এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, খেয়াল করিনি। আমি তাকাতেই ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে মাথা চুলকাতে থাকে। বললাম, ‘কিছু বলবি?’

ও মাথা উঁচু-নিচু করল।

কেন যে মিলুটা আমাকে ভয় পায়, আমি বুঝি না। আমার মনে পড়ে না আমি ওকে কোনো দিন মেরেছি। আসলে আমি সবার সঙ্গে খোলামেলা হতে চাই, কিন্তু সবার মধ্যেই কোথায় যেন একটা বাধা। আমার মধ্যেও বটে। নাকি মধ্যবিত্তের টনটনে রক্ত!

‘মাথা ঝাঁকাচ্ছিস কেন, মুখে বলতে পারিস না!’

‘তোমার ওই শার্টটা আমি পরব।’

‘কোন শার্টটা?’

‘ওই যে গত রোজার ঈদে বাবা তোমাকে কিনে দিয়েছে।’

ম্লান হাসি ভেসে ওঠে আমার মুখে। ইচ্ছে ছিল শার্টটা আমি পরব। কিন্তু সামান্য এ চাওয়া-পাওয়ায় কোনো ব্যর্থতা আমার সহ্য হয় না, ‘বেশ তো পর।’

উজ্জ্বল একটা হাসির রেখা টেনে মিলু চলে যায়। আনন্দে মনটা ভরে ওঠে আমার।

ছোটকালে মা সাধারণত বাবার প্যান্ট অথবা শার্ট কেটে আমাদের শার্ট-প্যান্ট বানিয়ে দিত। তখন ওইসব জিনিস পাওয়ার আনন্দেই সারা দিন না খেয়ে কাটিয়ে দিতাম। উপযাচক হয়ে একে-ওকে দেখাতাম, ‘এই দেখ, আমার নতুন শার্ট-প্যান্ট।’

বারান্দার পাশে গন্ধরাজ গাছটিতে অসংখ্য কলি এসেছে। খুব সুন্দর লাগছে কলিগুলো। ভালোভাবে নজর করতেই টের পেলাম, বেশ কয়েকটা কলির অর্ধেকটা কীভাবে যেন উধাও হয়ে গেছে। কালো হয়ে গেছে কলিগুলো। খুঁজতে খুঁজতে গাঢ় সবুজ কয়েকটা পোকা পেলাম। কী শান্তভাবে ওরা কলি খেয়ে চলছে। সাধারণ মানুষের মতো কলিগুলো স্থির হয়ে আছে, আর পোকাগুলো কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে।

কাঁধে হাতের ছোঁয়া পেতেই দেখি ভাবী দাঁড়িয়ে। হাসি হাসি মুখটা বিষণ্ন।

‘কী হয়েছে, ভাবী?’

‘ওরা আসবে না।’

চমকে উঠে বলি, ‘কেন?’

‘ওদের চাওয়াটা অনেক বেশি, পিন্টু।’

‘তাতে কী?’

‘সে চাওয়া কি তুমি পূরণ করতে পারবে?’

‘এবারও যৌতুক!’ থমকে যাই আমি।

‘হ্যাঁ, পিন্টু।’

‘কে খবর দিল, ভাবী?’

‘একটা লোক এসেছে চিঠি নিয়ে। চিঠিতে লেখা জিনিসগুলো দিতে সম্মত হলেই নাকি ওরা রাবুকে দেখতে আসবে।’

বিকেল না হতেই চারদিক কেমন যেন অন্ধকার হয়ে এল। বারান্দায় বসে বাবা পুরনো একটা পত্রিকা পড়ছেন খুব মনোযোগ দিয়ে। মিলুটা বেরিয়ে গেছে। বিলু কলতলায় বসে বাসন-কোসন মাজছে। মা দাঁড়িয়ে আছে বাবার কাছ ঘেঁষে। মায়ের চোখের স্রোত তার পাউডার মাখানো গালে রেখা এঁকে দিয়ে ঠোঁটের কোনায় থেমে গেছে।

অসম্ভব মাথা ধরেছে আমার।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। বেশ রাত হয়েছে। খুট করে একটা শব্দ হতেই তাকিয়ে দেখি বড়'পা। বললাম, 'বসো, আপা।'

খুব স্বাভাবিকভাবে বড়'পা আমার কাছে এসে বসে। তারপর মাথা নিচু করে কী যেন ভাবতে থাকে। একটু উৎসুক হয়ে বলি, 'কিছু বলবে, আপা?'

পূর্ণ চোখে বড়'পা আমার দিকে তাকায়। তারপর খুব ধীরে ধীরে বলে, 'একটা সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না রে।'

'সমস্যাটা কী?'

'তুই তো বাণিজ্যের ছাত্র ছিলি, পণ্য নিশ্চয় জিনিস?'

আমি আপার দিকে গভীরভাবে তাকাই।

'একটা পণ্যের সঙ্গে একটা মেয়েমানুষের পার্থক্য কোথায় জানিস? বাজারে প্রদর্শন করা পণ্য মানুষ দেখে-শুনে টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায়, আর মেয়েমানুষকে দেখে-শুনে টাকাসহ নিয়ে যায়। এবার বল, একটা পণ্যের চেয়ে একটা মেয়েমানুষের মূল্য কতটুকু কম?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বড়'পা। মাথা নিচু করে ফেলি আমি, চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে আমার।

আগের মতোই বড়'পা স্বাভাবিকভাবে বলে, 'একটা কথা রাখবি?'

'কী কথা, বলো।'

বড়'পা আমার ডান হাতটা টেনে নিয়ে তার মাথায় চেপে ধরে, 'বল রাখবি?'

মাথা নিচু করেই বলি, 'এ মুহূর্তে আমি তোমার সব কথা রাখব, আপা।'

'সারা বাড়ি খুঁজেও কোনো বিষ পেলাম না রে, একটু বিষ এনে দিতে পারবি?'

একটানা ঝিঁঝিঁ ডেকে চলছে। আমি রাস্তায় নেমে আসি। কালো রাত। ধু-ধু রাস্তা। শান্ত চারদিক। পৃথিবীর সবকিছু আমার কাছে ঈশ্বরের মতো নির্লিপ্ত মনে হতে থাকে।

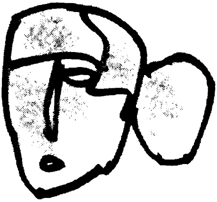

পেট

লোকটা ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়েই চোখ দুটো বড় বড় করে ফেলল। এ ধরনের ঘটনায় যতটা অবাক হওয়ার কথা, অবাক হলো সে একটু বেশিই। কিছুক্ষণ সেভাবেই তাকিয়ে থেকে শেষে কিছুটা ইতস্তত করে দুপা এগিয়ে এলো। তারপর মজিদ মিয়ার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'কী বললে?'

ম্লান হাসে মজিদ মিয়া। কিছু বলল না।

'তুমি কি আমার কথা শুনতে পেয়েছ?'

'জি।'

'তাহলে আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'লজ্জা লাগছে।'

'কেন?' একটু শব্দ করে বলে লোকটি।

'মনে হচ্ছে আমি ভুলভাবে কথাটা বলেছি।'

'না, তুমি ভুল বলনি।'

মজিদ মিয়া লজ্জিত মুখে আবার বলে, 'উড ইউ প্লিজ কাউন্ট ইউর মানি, স্যার। মানে টাকাটা যদি একটু গুনে দেখতেন, স্যার।'

চোখ দুটো শান্ত হয়ে এলো লোকটির। অবাক হওয়ার চরম মুহূর্তে সে আরো ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'তুমি লেখাপড়া জানো?'

আগের মতোই হাসে মজিদ মিয়া, ম্লান হাসি। কাঁধে রাখা গামছা দিয়ে ঘেমে যাওয়া মুখটা মুছে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে। তারপর লোকটার দিকে একপলক তাকিয়ে মাথাটা নিচু করে ফেলে সে। পা দিয়ে মাটির ওপর কী যেন আঁকতে আঁকতে বলে, 'সম্ভবত আমি আপনার সময় নষ্ট করছি, স্যার। টাকাটা যদি একবার গুনে দেখতেন, কম দিয়েছি না ঠিক দিয়েছি।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পকেটে রেখে দেওয়া টাকাগুলো বের করে লোকটি। পঞ্চাশ টাকার একটা নোট দিয়েছিল সে মজিদ মিয়াকে, সেখান থেকে পনেরো টাকা ভাড়া বাবদ রেখে বাকি পঁয়ত্রিশ টাকা ফেরত দেওয়ার কথা। টাকাগুলো গুনতে গিয়ে দেখে দুটো দশ টাকার নোট ও দুটো পাঁচ টাকার নোট। এটা দেখে মজিদ মিয়া সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বলে, 'আই অ্যাম সরি, স্যার,

এক্সট্রেমলি সরি।'

লোকটার চোখে-মুখে আগের চেয়ে বেশি অবাক হওয়ার চিহ্ন। মজিদ মিয়া সেদিকে খেয়াল না করে তার কোমরের কাছে লুঙ্গির ভাঁজে হাত দিল। টাকাটা সেখান থেকে বের করতে গিয়েই বাধা পেল সে। লোকটা তার হাত ধরে ফেলে এবং হাসতে হাসতে বলে, 'থাক, লাগবে না।'

'না না, তা কেন?'

'মাত্র পাঁচ টাকাই তো, যান, টাকাটা আমি আপনাকে চা খেতে দিলাম।' লোকটা চলে যেতে নিয়েই থেমে যায় এবং অল্প একটু ঘুরে ফিরে তাকায় মজিদ মিয়ার দিকে। মজিদ মিয়া স্পষ্ট দেখতে পায়, লোকটার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, অদ্ভুত এক প্রশান্তি ভেসে আছে সেখানে।

লোকটা চলে যেতেই মন খারাপ হয়ে যায় মজিদ মিয়ার। ইদানীং প্রায়ই এ ব্যাপারটা হচ্ছে, মন খারাপ হয়ে যায় তার। যদিও একজন রিকশাওয়ালার প্রতিদিন মন খারাপ হওয়ার অনেক কারণ থাকে, তবুও অন্য এক কারণে, অন্য এক ভাবনায় ইদানীং বিষাদে ছেয়ে যায় তার সবকিছু। আগে কোনো কারণে মন খারাপ হলে চুপচাপ বসে থাকত সে, এখন ছটফট করে, বুকের ভেতরটা চেপে আসে অসহ্য গুমোট যন্ত্রণায়।

রাস্তার পাশে রিকশাটা রেখে একটা গাছের নিচে বসে পড়ে মজিদ মিয়া। মন খারাপ হলেই একসময় এভাবে বসে একটা সিগারেট ধরাত। এখন নেশাটা করে না। না করার পেছনে ছোটখাটো একটা ইতিহাস আছে। একবার তার সাড়ে পাঁচ বছর বয়সী বড় ছেলেটা কাছে এসে হঠাৎ বলে, 'বাপজান, আমারে একটা সিগারেট দ্যাও।'

চমকে ওঠে মজিদ মিয়া এবং কিছুটা চিৎকার করে বলে, 'ক্যা?'

'আমার মন খারাপ।'

'কী অইছে?'

'মা আমারে খাওন দেয় নাই।'

'অ, এই জন্য মন খারাপ। তা সিগারেট দিয়া কী করবি?'

'আগুন ধরায়া টানুম।'

'ক্যা?'

'কইলাম না মন খারাপ।'

'মন খারাপ অইলে সিগারেট টানতে অয়, এ কতা তরে কে কইল?'

'ক্যা, মার সাথে কাইজ্যা কইর‍্যা মাজে মাজে তুমার মন খারাপ অয়, তখন তুমি একলা বইস্যা বিড়ি টানো না?'

বুকের ভেতর হু হু করে ওঠে মজিদ মিয়ার, এ পিচ্চি পোলা কয় কী! প্রচণ্ড শরম পায় মজিদ মিয়া। বাপ-মায়ের কাছ থেকে ছেলে-মেয়েরা শিখবে ভালো কিছু, ভালো শিক্ষা নিয়ে তারা বড় হবে, মানুষ হবে। কিন্তু এ সে কী শিখিয়েছে

নিজের ছেলেকে! কষ্টে চোখে পানি এসে যায় তার এবং সেদিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, এ জীবনে আর কোনো দিন এ জিনিস স্পর্শ করবে না। মজিদ মিয়া তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে, এত দিন হয়ে গেল সে আর কোনো দিন এ জিনিস ছুঁয়েও দেখেনি।

শরীর ঘেমে যাচ্ছে তার, গরম পড়েছে বেশ। গামছা দিয়ে মুখটা মোছার পর চা খেতে ইচ্ছে করে ভীষণ। সামনেই কেটলি হাতে এক চাওয়ালাকে দেখে ডাক দেয় মজিদ মিয়া। এক কাপ চা নিয়ে আয়েশ করে চুমুক দিয়েই সে চাওয়ালার দিকে ভালোভাবে তাকায়, বুকটা খাঁ খাঁ করে ওঠে তার। একেবারে তার ছেলের বয়সী, বড় ছেলেটা কাছে থাকলে এতদিন এত বড়ই হতো। কোথায় যে সে আছে এখন, কার কাছে যে আছে! মজিদ মিয়া আরেক কাপ চা নেয় এবং চুমুক দিতে দিতে কী যেন ভাবে অনেকক্ষণ।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মজিদ মিয়া। অলস পায়ে রিকশার কাছে দাঁড়াতেই পেছন থেকে কে যেন ডাক দেয়। প্রথমে টের পায় না সে। ডাকটা আবার শুনতে পায়, 'এই রিকশা, যাবে?'

পাশ ফিরে মজিদ মিয়া দেখে এক মহিলা একটা বাচ্চা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মুখটা হাসি হাসি করে সে বলল, 'কোথায় যাবেন, আপা?'

'মিরপুর।'

'ওঠেন।'

রিকশায় পা ওঠাতে নিয়েই মহিলাটি পা নামিয়ে বলে, 'ভাড়া কত?'

মুচকি হেসে মজিদ মিয়া বলে, 'আপনি তো মনে হয় প্রতিদিন যান, যা ভাড়া তাই দিয়েন।'

'ভাড়া কিন্তু ষোল টাকা, যাবেন?'

আগের মতোই মুচকি হেসে মাথাটা কাত করে সায় দেয় মজিদ মিয়া। মহিলাটি বাচ্চাসহ রিকশায় উঠে বসতেই রিকশার হুডটা তুলে দেয় সে।

মিরপুর গোল চত্বরের আগেই মহিলাটি রিকশা থামাতে বলে মজিদ মিয়াকে। রাস্তার একপাশে থেমে মজিদ মিয়া মুখটা আবার মুছে নিল গামছা দিয়ে। মহিলাটি ব্যাগ থেকে বিশ টাকার একটা নোট বের করে তাকে দিতেই মজিদ মিয়া বলে, 'ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আমি কি আপনাকে একটা কথা বলতে পারি?'

গলায় পানি ঠেকে গেলে মানুষের যেমন চেহারা হয়, সেরকম হয়ে গেল মহিলাটি এবং স্বাভাবিক হতে তার সময় লাগে ঝাড়া দশ সেকেন্ড। মজিদ মিয়া তার চিরাচরিত মুচকি হাসি দিয়ে বলে, 'কোনো সমস্যা, আপা?'

'ন ন্ না।' মহিলাটি আমতা আমতা করে, 'কী যেন বলবেন আপনি?'

'না থাক, আপা। এখন আর বলতে ইচ্ছে করছে না কথা।' মাথা নিচু করে ফেলল মজিদ মিয়া।

'না না, বলুন, কোনো অসুবিধা নেই।'

'এক্সকিউজ মি আপা, আমার আসলেই এখন বলতে ইচ্ছে করছে না, পরে কোনো একদিন না হয় বলব।'

'পরে কি কোনো দিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে আমার?'

'অনলি গড নোজ।' মজিদ মিয়া একটু থেমে বলে, 'ঠিক আছে আপা, কথাটা আপনাকে বলেই ফেলি। বাইরে থেকে দেখে মানুষকে বোঝা যায় না, তবুও আমার কেন যেন মনে হয় অ্যাজ এ পারসন, আপনি খুব ভালো একজন মা। অ্যাম আই রাইট, আপা?'

'কী জানি!' মহিলা লজ্জামাখা হাসি দিয়ে রিকশা থেকে নেমে বলে, 'আচ্ছা, এবার আপনাকে একটা কথা বলি?'

'ও সিওর।'

'আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে রিকশা চালান কেন?'

কোনো কথা বলে না মজিদ মিয়া। লুঙ্গির ভাঁজ খুলে দশ টাকার একটা নোট বের করে সে বলে, 'আপা, আমার কাছে তো খুচরা নেই, আপনার...।'

কথাটা শেষ করতে পারল না মজিদ মিয়া, মহিলাটি তার আগেই বলল, 'না না, কোনো টাকা ফেরত দিতে হবে না, পুরো বিশ টাকাই রাখুন আপনি।'

'কেন!'

'সব কেনর উত্তর হয় না।' বিজ্ঞের মতো কথাটা বলে মহিলাটি হনহন করে হেঁটে চলে গেল পাশের গলিতে।

মজিদ মিয়ার মন খারাপ হয়ে যায় আবার। রিকশার হাতল ধরে ঠেলতে ঠেলতে একটা ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ায় সে। বড় বউটার কথা মনে পড়ে যায় এ সময়। অসম্ভব ভালো ছিল বউটা, সারাক্ষণ পান খেত আর গুনগুন করে গান গাইত। কোনো আবদার ছিল না তার, শুধু মাসে একবার সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে হতো। অল্প বয়স ছিল তো। সিনেমা দেখার সেই দিনটায় সে মুখ ভরে পান খেত, লাল টকটকে করে ফেলত সারা মুখ। আর যত রকমভাবে সাজা যায় সে সাজত। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মজিদ মিয়া হঠাৎ বউয়ের হাত ধরে বলত, 'তোমারে পরীর মতো লাগছে বউ।' বউ তখন চোখ দুটো বড় বড় করে বলত, 'আচ্ছা, আপনে এইড্যা কোন বইয়ের ডায়লগ কইলেন?' মজিদ মিয়া ফ্যালফ্যাল করে বউয়ের দিকে তাকাতেই বউ নাছোড়বান্দার মতো তার হাত চেপে ধরে বলত, 'কন না কোন বইয়ের, ওই যে নায়ক নায়িকারে জড়ায়া ধইর‍্যা কতাটা কয়?'

বউয়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মজিদ মিয়া ঘরের বাইরে এসে উঠোনের কাঁঠাল গাছের নিচে বসে। উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। হঠাৎ পেছন থেকে চোখ চেপে ধরে বউটা বলে, 'কন তো কেডা?'

'কেউ না, আমি তোমারে চিনি না, তুমি আমার কেউ না।' গম্ভীর মুখে বলে

মজিদ মিয়া।

অবাক হয়ে বউ চোখ বড় বড় করে বলে, 'আপনি রাগ কইরছেন?'

'সিনেমার নায়কই শুধু ও কতা কইতে পারে, আমি পারি না।'

'ও আল্লা!' চোখ ছেড়ে দিয়ে সামনে এসে বসে বলে, 'আমি মাফ চাই, আপনিও তো আমার নায়ক।'

প্রচণ্ড গরমে দক্ষিণের বাতাসের মতো বউয়ের কথাটা বুক জুড়িয়ে দেয় মজিদ মিয়ার। মুখে হাসি নিয়ে বউয়ের হাত দুটো টেনে নিজের বুকের কাছে এনে বলে, 'তোমারে একটা পান বানায়া খাওয়া দেই আমি?'

বউ শরম শরম মুখে বলে, 'সেদিনকার সিনেমায় নায়িকার মুখে নায়ক যেভাবে পান তুইল্যা দেয় সেভাবে?' মজিদ মিয়া মুখটা আবার ম্লান করতেই বউ আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে বলে, 'এটটু মশকারা করলাম।'

সেদিনের কথা, স্পষ্ট মনে আছে তার। বড় ছেলেকে জন্ম দেওয়ার ছয় বছর পর একটা মেয়ের শখ হলো বউটার। ডেলিভারির দিন সে মজিদ মিয়াকে বলে, 'সেলিমের বাপ, এবার মনে হয় আমি বাঁচুম না। আপনি আমারে মাফ কইর‍্যা দিয়েন, সেলিমরে দেইক্যা রাইখেন। আর একা একা কয়দিন থাকবেন, পারলে আরেকটা বিয়া কইরেন।'

বউটার চোখে পানি, তবু হাসতে হাসতে বলে, 'আপনে মন খারাপ করেন কেন সেলিমের বাপ, আপনের মন খারাপ হলে আমার ভালো লাগে না।' শোয়া অবস্থায় সে পাশে বসে থাকা মজিদ মিয়ার মুখটা মুছে দেয় আঁচল দিয়ে। বউটার সারা মুখ লাল, এ অবস্থাতেও সে পান খাচ্ছে।

বাচ্চা হতে গিয়ে বউটা সত্যি সত্যি মারা গেল, বাচ্চাটাও মারা গেল। মেয়ে বাচ্চা। কদিন পর মা-হারা ছেলেটা যে কোথায় চলে গেল আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

পাশে দুটো কুকুরের চিৎকারে ভাবনাটা ভেঙে যায় মজিদ মিয়ার। গামছা দিয়ে মুখটা আবার মুছে নেয়। এ মুহূর্তে কিছুই ভালো লাগে না তার। শরীরটা কেমন যেন ভেঙে ভেঙে আসে। কদিন ধরে ছোট বউটার শরীরও ভালো যাচ্ছে না, ভালো একটা ডাক্তারের কাছে নেওয়া দরকার, কিন্তু...। আর ভাবতে ইচ্ছে করে না মজিদ মিয়ার। শব্দ করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে সে।

হ্যান্ডেলটা চেপে ধরে মাটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে মজিদ মিয়া। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে রিকশাটা চালিয়ে নিয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। কিচ্ছু ভালো লাগছে না তার। একা একা অনেকক্ষণ চালিয়ে সে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে। কোনো আরোহী নিয়ে এখন আর রিকশা চালাতে ইচ্ছে করছে না তার। হঠাৎ সে একটা বাড়ির কাছে রিকশাটা থামায়। তারপর রিকশা থেকে নেমে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় বাম পাশের ঘরটার দিকে। ঘরের ঠিক দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সে। কিছুক্ষণ ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পর

ইতস্তত ডান হাতটা চাপ দেয় কলবেলে। থেমে থেমে বেজে কলবেলটা একসময় থেমে যায়। কিন্তু দরজা খোলে না কেউ।

আগের চেয়েও ইতস্তত ভঙ্গিতে কলবেলে আবার চাপ দেয় মজিদ মিয়া। দরজায় অপলক চোখ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর চলে আসতে নিয়েই দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকায়, দেখে কাঙ্ক্ষিত মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জামাখা হাসিতে সালাম দেয় সে মানুষটাকে। গম্ভীর অথচ আন্তরিক স্বরে মানুষটি বলে, 'মজিদ মিয়া, আপনি?'

মাথা চুলকাতে চুলকাতে মজিদ মিয়া বলে, 'একটা কথা বলতে এসেছি, স্যার।'

'কোনো সমস্যা?'

'না, স্যার।'

'তাহলে?'

দরজা ছেড়ে মানুষটি একটু পিছিয়ে যায়। ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ মিয়া। হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে ঘরের ভেতর আসতে বলতেই শরম পাওয়া পায়ে এগিয়ে যায় সে। সোফার মতো একটি চেয়ারে বসতে বসতে মানুষটি তাকেও বসতে বলে, কিন্তু সে বসে না, কেমন যেন কাঁচুমাঁচু হয়ে থাকে। মুচকি হেসে মানুষটা আরো একটু আয়েশ করে বসে বলেন, 'আপনি কেন এসেছেন বলুন?'

'মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে আছে, স্যার।'

'বহুদিন পরে এলেন আপনি, তাও আবার মন খারাপ করে। ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

'স্যার।' মাথাটা নিচু করে মজিদ মিয়া মেঝের দিকে তাকায়, 'কদিন পর আমার বউটার বাচ্চা হবে। ভীষণ ভয়ে আছি, স্যার।'

'কেন?' মানুষটা একটু ঝুঁকে আসে মজিদ মিয়ার দিকে।

'আগের বউটা এই বাচ্চা হতে গিয়েই মারা গেছে। ডাক্তার সাহেব ভালো ভালো খাওয়াইতে বলেছিল, কী কী যেন পরীক্ষা করতে বলেছিল—কিছুই করতে পারি নাই। পয়সার অভাবে আমাদের মতো মানুষরা কী-ইবা করতে পারে। চাল কিনতে গেলে ওষুধ কেনা হয় না, ওষুধ কিনলে চাল কেনা হয় না।'

'আপনার কি খুব বেশি সমস্যা যাচ্ছে?'

'না, আপাতত তেমন সমস্যা যাচ্ছে না। তবে...।'

'তবে কী বলুন।'

'বুকের ভেতরটা কামড়ায়, স্যার। আমি যে কাজটা করি, সেটা ভেবে সারাক্ষণ মন খারাপ হয়ে যায়, আমার সারাক্ষণ মনে হয় আমি মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছি, যদিও পাঁচ-দশতলা দালান করার জন্য তা করি না, স্যার।'

‘সম্ভবত এটাকে ঠিক প্রতারণা বলে না।’

‘কী জানি স্যার, কিছুই বুঝতে পারি না।’ মজিদ মিয়া মুখটা অসম্ভব দুঃখী দুঃখী করে বলে, ‘মানুষ ভালো থাকার জন্য, আনন্দ করার জন্য, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ বাড়ানোর জন্য কত কী করে! আর আমি কেবল এই পেট বাঁচানোর জন্য, জীবন বাঁচানোর জন্য কাজটা করি, স্যার।’

‘তাতে তো কোনো অসুবিধা দেখছি না।’

‘আপনি সত্যি বলছেন স্যার, কোনো অসুবিধা নেই! মুখ্য-সুখ্য মানুষ আমরা, অনেক কিছুই বুঝতে পারি না।’ ম্লান মুখটায় সামান্য হাসি এনে মজিদ মিয়া বলে, ‘তাহলে স্যার কথাটা বলেই ফেলি, আপনার কাছ থেকে যে কয়টা ইংরেজি কথা শিখেছিলাম, সেগুলো বেশ কাজ দিয়েছে, স্যার। যদি আরো কয়েকটা ইংরেজি কথা শিখিয়ে দিতেন!’

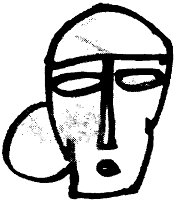

আয়না

এক

তেত্রিশ বছর পর সিরাজ সাহেব একটা আয়না কিনলেন। তারপর সেটা মেলে থাকেন তার মুখের সামনে। হাত দিয়ে চশমাটা একটু সোজা করে তাকিয়ে রইলেন গভীর দৃষ্টিতে। কুঁচকে যাওয়া মুখের চামড়া আর সাদা-কালোর মিশ্রণে মাথার চুল। দাড়ি পেকে সাদা ধবধবে। দাঁত পড়ে গেছে বেশ কয়েকটা। মুখের দুপাশটা তাই গর্ত গর্ত। বেশ কিছুক্ষণ নিজেকে এভাবে দেখে আয়নাটা সরিয়ে আনেন সামনে থেকে। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দৃষ্টি মেলে দেন শূন্যে। আটাশ বছর বয়সে তিনি নিজ হাতে প্রথম একটা আয়না কিনেছিলেন। বিয়ের ঠিক আগের রাতে, খুব গোপনে। নকশি করা আয়না। বাসররাতে খুব সোহাগ করে তিনি আয়নাটা দিয়েছিলেন নতুন বউকে। বউ তো হেসে কুটিকুটি। হাসিখুশি সে বউটা মারা গেছে কবে, এতদিন পর তিনি আরেকটা আয়না কিনলেন আজ। প্রায় সেরকমই একটা আয়না, নকশি করা আয়না।

খুব যত্নের সঙ্গে আয়নাটা কাগজে মুড়ে নিয়ে সিরাজ সাহেব সেটা রেখে দেন তার ব্যাগে। চেহারায় তৃপ্তির একটা আমেজ এনে মিষ্টি একটু হাসলেন। ধীরে ধীরে হাত ঢোকান পাঞ্জাবির বুকের কাছে ভেতরের পকেটে। খুচরো বেশ কয়েকটা টাকা বের করে গুনতে লাগলেন মনোযোগ দিয়ে। আঙুলে থুথু লাগিয়ে পর পর তিনবার তিনি টাকাটা গুনলেন। তারপর সেখান থেকে দু টাকার একটা নোট আলাদা করে টাকাগুলো দিয়ে দেন দোকানদারকে। বাইশ টাকা। দোকানি দু চোখে দুষ্টু দুষ্টু ভাব এনে খুব মিষ্টি স্বরে বলল, 'চাচা, আয়নাটা কার জন্য কিনলেন?'

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েই সিরাজ সাহেব আবার ফিরে দাঁড়ান। চশমার আড়ালের চোখ দুটো উঁচু করে তাকিয়ে দেখলেন দোকানিকে। কিছু বললেন না। দোকান থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়ান। দোকানি মুখ চেপে হেসে ফেলল। সামান্য শব্দ হলো তাতে। শব্দটা শুনে ফেললেন তিনি। খুব বিশ্রী মনে হলো সেটা। হাঁটতে নিয়ে একটু যেন থমকানও তিনি, তারপর আবার হাঁটতে লাগলেন। তার আগে আয়নাসহ ব্যাগটা চেপে ধরেন শক্ত করে।

দুই

বেশ আনন্দ নিয়ে বাসায় ফেরেন সিরাজ সাহেব। ক্লান্তি ক্লান্তি লাগছে। এতটা পথ হেঁটে এসে হাঁফিয়ে উঠেছেন তিনি। বারান্দার কোণের চেয়ারটায় বসেন খুব ধীরে ধীরে। মুখটা তেতো হয়ে গেছে। এক গ্লাস পানি হলে ভালো হতো। কিন্তু আশপাশে কেউ নেই। কাউকে ডাকতেও ইচ্ছে করছে না।

ব্যাগটা চেয়ারের একপাশে রেখে তিনি পিঠটা হেলিয়ে দেন চেয়ারে। চোখ বুজে ফেলেন। না, কোনো ভাবনা আসছে না। মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। তিনি তবুও জোর করে একটা সুখস্মৃতি জাগাতে চাইছেন। কিন্তু বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন।

ঘুম-ঘুম একটা ভাব আসছে। চোখ বন্ধ করে সিরাজ সাহেব চেয়ারেই হেলান দিয়ে থাকেন। হঠাৎ ধপধপ একটা শব্দে চোখ মেলে তাকান তিনি। টুসী দৌড়ে আসছে। সিরাজ সাহেব সোজা হয়ে বসেন। হাঁফাতে হাঁফাতে টুসী তার একটা হাত জাপটে ধরল। তারপর খুব আস্তে করে বলে, 'দাদু, তোমার ব্যাগে কী?'

মুচকি হাসলেন সিরাজ সাহেব। গভীর মমতায় তিনি তার একমাত্র নাতনির দিকে তাকান। আলতোভাবে ওর হাতটা ধরে কাছে টানেন। পকেট থেকে রুমালটা বের করে টুসীর কপালের ঘামগুলো মুছতে মুছতে বলেন, 'স্কুলে আজ সব পড়া পেরেছ?'

মাথাটা কাত করে টুসী।

'গুড।'

'দাদু, তুমি বললে না ব্যাগের ভেতর কী?'

'একটা জিনিস।'

'কী জিনিস?'

'দেখতে ইচ্ছে করছে?'

'হুঁ।' মাথা উঁচু-নিচু করে টুসী।

সিরাজ সাহেব শব্দ করে হেসে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে বুকের বাঁ পাশটায় কেমন যেন চিড়িক দিয়ে ওঠে। তিনি হাসি থামিয়ে দিলেন। মুখটা বিষণ্ন করে ডান হাত দিয়ে হাতাতে থাকেন ঐ জায়গাটা।

শরীরটা ভালো যাচ্ছে না ইদানীং। বুকের ব্যথাটা বেড়েছে। চোখেও কেমন যেন আগের মতো দেখছেন না। ঝাপসা ঝাপসা ভাবটা মনে হচ্ছে বেশি। ডাক্তারের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কে নেবে ডাক্তারের কাছে? ডাক্তার মানেই একগাদা টাকা। সারা জীবন তিনি এই একটা জিনিসের প্রতি নজর দেননি। ব্যবসা করেছেন, আয় করেছেন, দুহাত ভরে খরচ করেছেন। হঠাৎ একবার ব্যবসায় মার খেলেন, আর দাঁড়াতে পারেননি। একেবারে নিঃস্ব।

এখন দিন কাটে তার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে।

বড় ছেলে কী একটা চাকরি করে। সে, তার বউ, তার ছয় বছরের মেয়ে টুসী—তার নিজেরই একটা সংসার। তার ওপর তিনি নিজে, বিবাহযোগ্য মেয়ে তাজীন আর এক ছেলে রতন। যার রাজনীতি সর্বক্ষণের ধ্যান। প্রায় সময়ই সে বাড়ির বাইরে থাকে। মাঝে মাঝে আসে, আবার চলে যায় জনসেবার প্র্যাকটিস করতে।

চা খেতে ইচ্ছে করছে খুব। এক কাপ চা হলে খুব ভালো হতো। চায়ের কথা মনে হতেই হাসি পেল তার। নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারে প্রয়োজনীয় চাহিদাই যখন মেটে না, তখন চায়ের মতো অবাঞ্ছিত খরচ কীভাবে হয়? তবুও প্রতিদিন সকালে এক কাপ চা তিনি পান। পরম তৃপ্তিভরে চা খেতে খেতে তিনি কত কী ভাবেন!

বড় দুই মেয়েকে তিনি বেশ ভালোই বিয়ে দিয়েছেন। তারা মোটামুটি সুখে আছে। মাঝে মাঝে তিনি তাদের কাছে যান। কয়েক দিন থেকে চলে আসেন। ইদানীং তাদের কাছেও যেতে ইচ্ছে করে না। একা একা ঘরে বসে থাকতেই এখন ভালো লাগে। ভালো লাগে ভাবতে—জীবন নিয়ে, দেশ নিয়ে, সমাজ নিয়ে। আর, আর একটাই ভাবনা—ছোট মেয়েটাকে বিয়ে দেয়া।

তাজীনটা কেমন যেন ইদানীং চুপচাপ হয়ে গেছে। আগের মতো ফুরফুর করে হাসে না, গুনগুন করে গান গায় না, কথা বলে না। মুখ কালো করে রাখে সবসময়। এগারোবার দেখার পরও যে মেয়ের বিয়ে হয় না, তার কষ্ট তো অসীম, সীমাহীন হবেই।

রুমাল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলেন সিরাজ সাহেব। এই বৃদ্ধ বয়সেও কারণে-অকারণে জল এসে যায় চোখে। সে জল সহজে থামে না।

'দাদু, তুমি কাঁদছ?'

চোখ মুছতে মুছতে সিরাজ সাহেব হাসার চেষ্টা করেন। তারপর টুসীকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'জিনিসটা দেখবে না?'

মাথাটা আবার উঁচু-নিচু করে টুসী। কৌতুক ভরা চোখে সিরাজ সাহেব তা দেখলেন। কৃত্রিম একটা গম্ভীরতা এনে টুসীকে বলেন, 'যা দেখবে, তার কথা কাউকে বলবে না তো?'

'বলব না।' টুসী লাফিয়ে ওঠার ভঙ্গিতে বলে।

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, তিন সত্যি। সত্যি, সত্যি, সত্যি।'

সিরাজ সাহেব ব্যাগ থেকে তার প্যাকেটটা বের করেন। খুব যত্ন করে সেটা খুলে আয়নাটা মেলে ধরেন টুসীর মুখের সামনে। অবাক হয়ে টুসী তাকিয়ে থাকে আয়নার দিকে। আলতো করে কাচে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'দাদু, এ তো বিয়ের আয়না।'

মুচকি হাসেন সিরাজ সাহেব।

'কার জন্য এনেছ, দাদু?'

আবারও সেরকম হাসলেন সিরাজ সাহেব। হাসিমুখে তিনি প্যাকেট করতে লাগলেন আয়নাটা। আগের মতো যত্নেই তিনি আবার তা রেখে দেন ব্যাগে। টুসী দাদুর হাতটা টানতে টানতে বলে, 'দাদু, বলো না কার জন্য এনেছ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সিরাজ সাহেব তাকিয়ে থাকেন টুসীর দিকে।

তিন

ঘুমের মধ্যেই সিরাজ সাহেব টের পেলেন কে যেন তাকে ডাকছে। কিন্তু তিনি চোখ খুলতে পারছেন না। ঘুমে কেমন যেন জড়িয়ে আছে তার চোখ। দুর্বল হয়ে গেছে শরীরটা। কোনো কিছু এখন আর ভালো লাগছে না। শুধু শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। ঘুমও যে ইদানীং ভালো হচ্ছে, তাও নয়। কেবল চোখ বুজে থাকা।

'বাবা, গোসল করবেন না?'

ডাকটা আবার শুনতে পেলেন সিরাজ সাহেব। তিনি সোজা হয়ে উঠে বসার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারলেন না। ঘুমজড়ানো চোখে মাথাটা কেমন যেন ঘুরে ওঠে। বিছানায় মাথা রেখেই তিনি আস্তে আস্তে চোখ মেলে সামনের দিকে তাকান। লুঙ্গি আর গামছা হাতে তাজীন দাঁড়িয়ে আছে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মৃদু হেসে তিনি ওঠার চেষ্টা করতেই বাবার হাতটা ধরে ফেলে তাজীন। সোজা হয়ে বসে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে তিনি বলেন, 'ডাকছিস কেন, মা?'

'গোসল করবেন না?'

'কয়টা বাজে?'

'একটু পর জোহরের আজান দিবে।'

'থাক, আজ আর গোসল করব না।'

'কালকেও তো করেননি।'

'ভালো লাগছে নারে মা, শরীরটা কেমন যেন দুর্বল হয়ে গেছে।'

আলতোভাবে বাবার গায়ে হাত রাখে তাজীন। গাটা গরম। জ্বর আসবে না তো! জ্বরের কথা মনে হতেই তাজীন নিঃশব্দে হেসে ফেলে। ছোটকালে যখন কারো জ্বর হতো, বাবা তখন অস্থির হয়ে যেতেন। এটা করো, সেটা করো, ওষুধ আনো, ডাক্তারের কাছে যাও, মনে হতো জ্বরটা বুঝি বাবারই হয়েছে। পিয়ালের একবার এক শ তিন জ্বর। মা অনবরত ওর মাথায় পানি ঢালছে, কিন্তু জ্বর কমছে না। এদিকে চোখ দুটো লাল টকটকে হয়ে গেছে ওর, মাঝে

মাঝেই অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা হচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে বাবা বাড়ি ফিরে পিয়ালের এ অবস্থা দেখে নিজেই ঘামতে লাগলেন এবং ঘামতে ঘামতে একসময় নিজেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

'বাবা, আপনি তাহলে হাত-মুখ ধুয়ে নিন, খেয়েদেয়ে আবার ঘুমাবেন।'

'খেতেও ইচ্ছে করছে না।' একটু থেমে সিরাজ সাহেব বলেন, 'পিয়ালকে যে সকালে দেখলাম না, ও গেছে কোথায়?'

'কোথায় যেন গিয়েছিল, এসেছে। ঐ যে টুসীর সাথে উঠোনে দুষ্টুমি করছে।'

'ডাক তো মা ওকে একটু।'

পিয়াল ঘরে ঢোকার সাথে সাথে বাবা সোজা হয়ে বসেন। খুক করে সামান্য কেশে তারপর বলেন, 'বাবা, এবার নিজের প্রতি একটু নজর দাও। লেখাপড়া তো তেমন হলো না, কী করবে কিছু ভেবে দেখেছ?'

মাথা নিচু করে পিয়াল দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু বলে না।

'ওসব রাজনীতি-ফাজনীতি করে কিছু হবে না। তোমরা যাদের পিছে ঘুরছ, তারা সবাই গভীর জলের মাছ। দেশে-বিদেশে তাদের পর্যাপ্ত সম্পদ। নিজেরা এখানে থাকে, পরম নির্ভরতায় ছেলেমেয়েকে পাঠিয়ে দেয় বিদেশে, পড়াশোনা করাতে। আসলে কারো প্রতি এদের মায়া নেই, সব মায়াকান্না।'

এবারও কোনো কথা বলল না পিয়াল। কিছুক্ষণ সেভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে যায় বাইরে।

উদাস চোখে ছেলের চলে যাওয়া দেখেন সিরাজ সাহেব। কেমন যেন কান্না পাচ্ছে। টলমল চোখটা অন্যদিকে ফেরাতেই এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে নামে গালে। তারপর আরো কয়েক ফোঁটা। রাস্তার ওপাশ দিয়ে একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুক হেঁটে যাচ্ছে ভিক্ষা করতে করতে।

চার

টুসী অনেকক্ষণ ধরে হাত টানছে আর বলছে, 'দাদু, বেড়াতে যাবো না আমরা?'

বিকেল হলেই সিরাজ সাহেব বেড়াতে বের হন। আগে একা একাই যেতেন। এখন টুসী সাথে যায়। সারা রাস্তা টুসী শুধু কথা বলে, এটা কী, ওটা কেন হলো। টুকটুক করে প্রত্যেকটা কথার তিনি জবাব দেন। মাঝে মাঝে টুসী এটা-ওটা খেতে চায়, তিনি কিনে দেন। অনেক সময় তার কাছে পয়সা থাকে না, তখন বড় বিব্রত হন তিনি।

ইদানীং কেন যেন বিকেলে তার বেড়াতে ইচ্ছে করে না। মনটা খারাপ হয়ে যায়। পাশের বাসার আব্বাস সাহেব একসময় তার সাথে বেড়াতেন। এখন

বেড়ান না। কেন যেন একা একাই ঘরে বসে কাটিয়ে দেন। তার দু ছেলে আমেরিকায় থাকে। তিন মেয়েকে ভালো বিয়ে দিয়েছেন, তারাও দেশের বাইরে থাকে। বাসায় শুধু তিনি আর তার স্ত্রী। নির্ঝঞ্ঝাট এক সংসার। তবুও কোথায় যেন একটা অসুখী ভাব। বয়স হলে বোধ হয় এমনই হয়।

বুক খালি করা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে নাতনির দিকে তাকান সিরাজ সাহেব। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে। মেয়েটা ওর দাদীর আদল পেয়েছে। গায়ের রঙটাও সেরকম। মনোয়ারার বড় শখ ছিল, ছেলে বিয়ে দিয়ে বউ দেখবে, নাতি-নাতনি দেখবে। কিন্তু তা আর হলো না। তার আগেই সে...। নাহ্, এসব ভাবতে আর ভালো লাগে না। তার চেয়ে বরং নাতনিকে নিয়ে ঘুরে আসা ভালো।

সিরাজ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। চামড়ার পাম্প সু জোড়া পায়ে দিয়ে আলমারির পাশ থেকে লাঠিটা হাতে নেন। মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে টুসী। সে দাদুর হাত ধরে প্রায় নাচতে নাচতে বের হয়ে আসে।

রাস্তায় পা দিয়ে সিরাজ সাহেব গল্প শুরু করেন। তার জীবনের গল্প, যৌবনের গল্প। টুসী কী বুঝল, কী বুঝল না, তিনি তা খেয়াল করেন না। তিনি গল্প করতেই থাকেন। তারপর গল্প একসময় থেমে যায়। টুসী তখন হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'তারপর কী হলো, দাদু?'

আর কিছু বলেন না তিনি। মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকেন। বুকের বাঁ পাশটার ব্যথাটা একটু একটু বাড়ছে। তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ দুটো মুছে নেন। অদ্ভুত এ মানবজীবন, এখানে এক সময় সব ফুরিয়ে যায়, কিন্তু চোখের পানি ফুরায় না। চোখ মুছতে মুছতে টুসীর হাত ধরে তিনি উদাসভাবে হাঁটতে থাকেন।

পাঁচ

ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু সিরাজ সাহেব ঘুমাননি। জেগে ছিলেন। যদিও চোখ দুটো বুজে আসছিল বারবার। বিছানা থেকে নেমে আলোটা জ্বালিয়ে দিতে গিয়েই থেমে গেলেন। জ্বালালেন না। রাত কত হয়েছে বোঝার চেষ্টা করেন। ঘরে কোনো ঘড়ি নেই, হাতঘড়িটাও নষ্ট হয়ে আছে অনেক দিন।

অন্ধকারের মধ্যেই নিঃশব্দে ঘরের দরজাটা খুলে বাইরে আসেন তিনি। ভ্যাপসা গরম পড়েছে। বাইরেও গরম বাতাস। চাঁদটা ঢেকে আছে মেঘে। কোথায় যেন একটা ছোট বাচ্চা কাঁদছে।

বেশ কিছুক্ষণ তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন চারদিক। পাশের বাসার মোক্তার সাহেবের ঘরে আলো জ্বলছে এখনো। প্যারালাইসিস রোগী। সারা রাত ঘুমান না, আলোও জ্বলে প্রায় সারা রাত।

প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েও একটা মানুষ এমন অসহায়ভাবে জীবন কাটাচ্ছে, ভাবতেই কষ্ট জাগে মনে।

'মিঁয়াও' করে একটা বিড়াল ডেকে ওঠে। চমকে ওঠেন সিরাজ সাহেব। মেঘ থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদটা। চারদিকে ফকফকা আলো। বিড়ালটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। গভীর মনোযোগে তিনি বিড়ালটাকে দেখেন। পেটটা বেশ উঁচু। বাচ্চা আছে পেটে।

হঠাৎ একটা ভাবনা খেলে গেল মাথায়। সোজা হয়ে দাঁড়ান তিনি। সঠিক সময়েই একটি বিড়াল বাবা কিংবা মা হতে পারে, এতে কোনো বিয়ের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মানুষের তা হয়। রাব্বুল আলামিন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বড় যত্ন করে, আদর করে, তার জন্য কষ্টও রেখেছেন কঠিন কঠিন। কেন?

সিরাজ সাহেব আর ভাবতে পারেন না। ধড়ফড় করছে বুকটা। ঘরের ভেতর চলে আসেন তিনি। টেবিলে রাখা পানি ভর্তি গ্লাসটা হাতে নিয়ে পানিটুকু খেয়ে ফেলেন অন্ধকারেই। অস্থির অস্থির লাগছে।

বিছানার পাশ থেকে দুপুরের সেই ব্যাগটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে আবার বের হন তিনি। এগিয়ে যান মেয়ের ঘরের দিকে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে দরজায় ঠুকঠুক শব্দ করে নিচু স্বরে ডাকেন, 'তাজীন, তাজীন...।'

বেশ কয়েকবার ডাকার পর ঘরের ভেতর থেকে তাজীন সাড়া দেয়, 'কে?'

'আমি, আমি মা।'

'কে, বাবা?'

'হ্যাঁ।'

দ্রুত ঘরের লাইটটা জ্বেলে দরজা খুলে দেয় তাজীন। অবাক চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'বাবা, এত রাতে?'

'তোর ঘরে একটু বসব, মা। কথা আছে।'

দরজা থেকে সরে দাঁড়ায় তাজীন। সিরাজ সাহেব ঘরে ঢুকেই গভীর একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন। পা দুটো তুলে তাজীনের বিছানার উপর বসেন। ব্যাগটা রেখে দিলেন পাশে। তাজীন বাবার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। সিরাজ সাহেব গভীর চোখে একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে মাথাটা নিচু করে বলেন, 'দরজাটা বন্ধ করে দে তো, মা।'

দরজা বন্ধ করার আগে তাজীন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। কী যেন দেখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে। তারপর ঘরে ঢুকে খুব নিঃশব্দে বন্ধ করে দেয় দরজাটা।

ছয়

আজ সকালে বেড়াতে বের হননি সিরাজ সাহেব। ঘুম ভাঙার পর একবার বিছানায় উঠে বসেছিলেন। পরক্ষণেই আবার শুয়ে পড়েন বিছানায়। বড্ড দুর্বল লাগছে আজ। টুসীকেও আজ স্কুলে নিয়ে যেতে পারেননি। টুসীর মা বোধ হয় নিয়ে গেছে। বৌমা সারা দিন সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাঁকে একটু সাহায্য করা দরকার, দুদিন ধরে তাও পারছেন না তিনি। খারাপ লাগছে এখন।

'বাবা, আসব?'

সিরাজ সাহেব বালিশ থেকে মাথা তুলেন, 'কে, শাহেদ?'

'জি, বাবা।'

'আয়।' উঠে বসেন তিনি।

শাহেদ ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ায়।

বিছানার পাশ থেকে পাঞ্জাবিটা নিয়ে গায়ের ওপর রাখেন সিরাজ সাহেব। ভীষণ গরম পড়েছে আজ।

'বাবা, বিকেলে যে লোকজন আসবে, আপনি কিছু ভেবেছেন?'

'কী আর ভাবব, মেয়ে যখন আছে, লোকজন তো আসবেই।'

'আমি তাহলে অফিস থেকে আজ একটু আগেই আসব।'

'হ্যাঁ, তাই ভালো হবে। আমি একা ঠিকমতো কুলিয়ে উঠতে পারব না।'

'পিয়ালকে বলেছেন?'

'ওকে আর বলা, বাড়িতেই ঠিকমতো থাকে না।'

'আমি তাহলে যাই, বাবা। তাজীনকে দেখতে কতজন বোধ হয় আসে। টুসীর মা বলল, কিছু নাকি কিনতে হবে।'

পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে সিরাজ সাহেব বাইরে বের হলেন। বেশ বেলা হয়েছে। কলতলায় বসে তাজীন অনেকগুলো বাসন-কোসন মাজছে। মুখটা কেমন কালো করে আছে। মেয়ের মলিন মুখ দেখে তিনি নিজেও বিষণ্ন হয়ে যান। বুকের ভেতর একটু চিনচিন করছে। একবার ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার।

সাত

সিরাজ সাহেব আজও ঘুমাননি। আজ অবশ্য ঘুম আসেনি। তিনি সারাক্ষণ বসে বসে ভেবেছেন। রাত কয়টা যে বাজল। তিনি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান। তারপর দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলেন।

পরিষ্কার আকাশ। তারা উঠেছে অজস্র, চাঁদটাও ঝকঝক করছে। আজ পূর্ণিমা নাকি? কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল। ভটভট করে একটা স্কুটার এসে থামে আব্বাস সাহেবের বাসার সামনে।

ঘুরে দাঁড়ান সিরাজ সাহেব। তাজীনের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই থেমে যান হঠাৎ। চারদিকে একবার তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন। তারপর আবার এগুতে থাকেন তাজীনের ঘরের দিকে।

দরজার সামনে এসে সিরাজ সাহেব দেখেন দরজার পাল্লা দুটো। ফাঁক হয়ে আছে। খুক করে একবার কেশে তিনি ডাকেন, 'তাজীন।'

ভেতর থেকে কোনো শব্দ নেই।

সিরাজ সাহেব আবার ডাকেন, 'মা তাজীন।'

এবারও কোনো জবাব আসে না।

পাল্লা দুটো আস্তে আস্তে আরো ফাঁক করে সিরাজ সাহেব ঘরে ঢোকেন। ঘরের জানালা দুটো খোলা। অন্ধকার ঘরটা চাঁদের আলোয় প্রায় ভরে গেছে।

খুক করে আবার শব্দ করে বিছানার দিকে তাকান সিরাজ সাহেব। তাজীন নেই। একটু চমকে উঠে পাশে তাকাতেই দেখেন টেবিলের উপর মাথাটা উপুড় করে চেয়ারে বসে আছে তাজীন। মাথার সামনে টেবিলে ঘড়িটা টিক টিক করছে। তার পাশে বইয়ের তাকের সাথে দাঁড় করানো আছে নতুন আয়নাটা। চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে। বিকেলে যে কাপড়গুলো পরেছিল তাজীন, সেগুলো এখনো পরে আছে। লাল ধরনের একটা শাড়ি, লাল ব্লাউজ। সিরাজ সাহেব মুখে একটু হাসি আনার চেষ্টা করে বললেন, 'মা, তোর মনটা নিশ্চয় খুব খারাপ।' একটু থেমে তিনি আবার বলেন, 'আমারও মনটা ভালো নেইরে, মা। আর কত? তুই মাঝে মাঝে বলিস, মেয়ে হওয়া খুব কষ্ট। কেন রে মা, পুরুষ মানুষের বুঝি কোনো কষ্ট নেই! তোর জন্য কি আমার কষ্ট হয় না?'

সিরাজ সাহেব আবার একটু থেমে বলেন, 'গত রাতে তুই আমার ওপর এভাবে রেগে গেলি। কী করব বল মা, মানুষ যখন কূল-কিনারা খুঁজে পায় না, তখন বোকা হয়ে যায়। তাই তো বোকার মতো তোর জন্য একটা আয়না কিনে আনলাম। তুই ভাঙা আয়নায় মুখ দেখিস তো, তাই। অনেকে বলে ভাঙা আয়নায় মুখ দেখা ভালো না।'

হাসতে থাকেন সিরাজ সাহেব। তাজীনের মাথার কাছ থেকে আয়নাটা হাতে নিলেন, 'মানুষ কী যে বলে, ভালো আয়নায় মুখ দেখলে নাকি মঙ্গল হয়, কই আমার তো হলো না। ভুল, সব ভুল।'

চোখে পানি এসে গেল তার। টলটল চোখে আয়নাটার দিকে তাকান। তারপর হঠাৎ করে সেটা ছুড়ে মারেন মেঝেতে। মাঝরাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙে দিল আয়নাটা। বুকের ভেতর কেমন যেন করে ওঠে। বিষণ্ন

চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তিনি টুকরোগুলোর দিকে। তাজীন এখনো ঘুমিয়ে আছে। এ সময় হঠাৎ করে বহুদিন আগের একটা কথা মনে পড়ে যায় সিরাজ সাহেবের। বাজার থেকে কিনে দেয়া ছোট্ট একটা ওড়না মাথায় দিয়ে ছোট্ট তাজীন প্রায়ই বলত, 'বাবা, আমি বউ সেজেছি দেখো, আমার বিয়ে কবে বাবা, ও বাবা বলো না।' কিছু বলতেন না তিনি। শুধু হাসতেন। তারপর একসময় ওকে কোলে নিয়ে হাঁটতেন। ওড়নাসহ মাথাটা এলিয়ে দিত কাঁধের এক পাশে। স্বচ্ছ লালায় ভেজাতে ভেজাতে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ত। চুপচাপ।

তাজীনের ঠিক সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সিরাজ সাহেব কি যেন ভাবলেন। সারা দিনের ক্লান্তি শেষে মেয়েটা কেমন শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে। আলতো করে হাত রাখেন মেয়ের মাথার ওপর। মৃদু একটা ঝাঁকুনি দেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা একদিকে কাত হয়ে যায়। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে অল্প। সাদা সাদা কী যেন বের হয়ে আছে সেখানে। শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল সিরাজ সাহেবের। পাগলের মতো তিনি মেয়ের বাম হাতটা চেপে ধরেন। কিছুটা শক্ত হয়ে গেছে হাতটা।

বিক্ষিপ্ত পা ফেলে ঘর থেকে বের হওয়ার মুহূর্তে থমকে দাঁড়ান সিরাজ সাহেব। কে যেন বলল, 'বাবা, আমি বউ সেজেছি দেখো, আমার বিয়ে কবে, বাবা?' ঝট করে তিনি পেছনে তাকান। নাহ্, কেউ নেই। শুধু জীবনের সব জটিলতা ছেড়ে তাজীনটা শুয়ে আছে চুপচাপ। একদম চুপচাপ। কিন্তু টেবিল ঘড়িটা চলছে আগের মতোই। টিকটিক, টিকটিক।

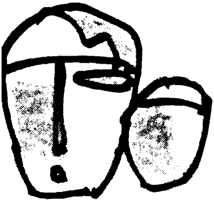

যন্ত্র

মাথার ওপর আলতো করে হাত রেখে বাবা বললেন, 'তুই কাঁদছিস কেন, রাশেদ?'

বাঁ হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখ দুটো মুছে আমি বলি, 'এমনি, বাবা।'

'এমনি কেউ কাঁদে?'

আমার গলা দিয়ে ঘোঁত করে একটা শব্দ হয়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে বুক, মুষলধারে বৃষ্টির মতো ঝরঝর করে পানি পড়তে থাকে চোখ দিয়ে। প্রচণ্ড চেষ্টা করি কান্না থামাতে, কিন্তু কান্না তো থামেই না, চোখ ভরে যায় জলে।

'ছিঃ রাশেদ, এভাবে কেউ কাঁদে!' আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বাবা বলেন, 'একটা যুবক ছেলে ফোত ফোত করে কাঁদছে, মানুষ বলবে কী!'

আমি আবার চোখ মোছার চেষ্টা করি, চোখ দিয়ে আবার পানি ঝরতে থাকে, বাবা আবারও প্রশ্ন করতে থাকেন।

মনোয়ারা আপা ক্লাস সিক্সে আমাদের বাংলা পড়াতেন, প্রচণ্ড ভালোবাসতেন আমাকে। প্রচুর টক খেতে পারতেন তিনি। আমাদের একটা বরই গাছ ছিল, জগতের সবচেয়ে টক বরই ধরত সে গাছটিতে। বরইয়ের দিনে আমি প্রতিদিন বরই নিয়ে যেতাম আপার জন্য। তিনি এত খুশি হতেন, মাঝে মাঝে পড়াই ধরতেন না আমাকে। আমিও তেমন পড়া করে যেতাম না তার ক্লাসে। একদিন আপা হাসতে হাসতে বললেন, 'রাশেদ, তোমাকে তো পড়া ধরা হয় না অনেক দিন। আচ্ছা বলো তো, 'ঝিঙে ফুল' কবিতাটা কে লিখেছেন?'

মাথা চুলকাতে চুলকাতে আমি বললাম, 'কাজী নুরুল ইসলাম।'

'কী!' আপা কিছুটা শব্দ করে বললেন।

ভালোমতো শুনতে পাননি আপা—এটা মনে করে আমিও কিছুটা শব্দ করে বললাম, 'কাজী নুরুল ইসলাম।'

চোখ দুটো বড় বড় করে আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন তিনি, যেন দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি আমি। বুকের ভেতর মৃদু মৃদু আনন্দ হতেই হেসে ফেলি ফিক করে। সঙ্গে সঙ্গে আপা তাঁর চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার বাম কানটা টেনে ধরলেন বেশ জোরেশোরে। যতটা

ব্যথা পাওয়ার কথা তার চেয়েও বেশি অবাক হয়ে আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। আপা আমার কান ধরেছেন—অবিশ্বাসের এই চরম সত্যটুকু কেমন যেন দুমড়ে উঠল বুকের ভেতর। আপার দিকে একটু চোখ তুলে দেখি, তার ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেছে, কেমন ভেজা ভেজা হয়ে গেছে চোখ দুটো। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপা আমার কান ছেড়ে দিলেন। তারপর পুরো সতের দিন তিনি আমাকে পড়া ধরেননি, কথাও বলেননি। এ সতের দিন চুপি চুপি কেঁদেছি আমি, আর সুযোগ পেলেই তার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকেছি। আপা আমার সঙ্গে কথা বলেন না, কষ্ট সেজন্য না; আমি পড়া পারিনি, আমি কাজী নজরুল ইসলামের জায়গায় কাজী নুরুল ইসলাম বলেছি, এতে তিনি ভীষণ দুঃখ পেয়েছেন, এ কষ্টেই প্রায় সারাক্ষণ কেঁদেছি আমি।

'বাবা, আপনার আজ ক্লিনিকে শরীর চেকআপ করতে যাওয়ার কথা, যাবেন না?' মাথা থেকে বাবার হাতটা আমার হাতে নিয়ে বলি, 'আমি কি আপনার সঙ্গে যাব?'

'না।'

'আপনি একা যেতে পারবেন তো?'

'ভাবছি আজকে আর যাব না।' আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে বাবা চলে যান পাশের ঘরে।

বাবাকে দেখলে একটা কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। ভীষণ অভাব ছিল একসময় আমাদের। তিন ভাই তিন বোনের সংসারে বাবাকে দেখতাম উদাস হয়ে একদিকে তাকিয়ে থাকতেন। সবার লেখাপড়া, সংসারের খরচ, আরো প্রয়োজনীয় অনেক ব্যাপারে ঝরে পড়া বৃক্ষের মতো মনে হতো বাবাকে।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হতো ঈদের সময়। আশপাশের সবাই ঈদের জামা-কাপড় কিনেছে, আমাদের এখনো কেনা হয়নি, এদিকে ঈদও এসে গেছে, আমরা সারাক্ষণ উসখুস করতাম। মায়ের পেছনে ঘুরঘুর আর ঘ্যানঘ্যান করতাম, মা একসময় বিরক্ত হয়ে বলত, 'তোর বাবাকে বলতে পারিস না?'

কথাটা শুনে আমরা মায়ের দিকে এমনভাবে তাকাতাম, যেন মা আমাদের আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেছে। কারণ বাবা প্রচণ্ড রাগী মানুষ ছিলেন, তাঁকে কখনই কোনো কিছুর কথা বলতাম না, বলতে সাহস পেতাম না আমরা।

বাবা কিন্তু ঠিকই আমাদের কষ্টটা বুঝতে পারতেন এবং যতই ঈদ এগিয়ে আসত তিনি ততই মুষড়ে পড়তেন। কিন্তু অলৌকিকভাবে ঈদের ঠিক একদিন কি দুদিন আগে আমাদের প্রায় সবাইকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে দিতেন তিনি। বড় আপা, মেজ আপা, ছন্দার এতে কোনো অসুবিধা হতো না। টাকা পেয়েই ওরা মার্কেটে চলে যেত আর তিনজনে মিলে সারা রাত তাদের জন্য অদ্ভুত সুন্দর পোশাক বানিয়ে ফেলত। অসুবিধা হতো শুধু আমাদের, মানে আমাদের ছেলেদের, দর্জি তখন কোনো অর্ডার নিত না। আমাদের ঈদের

কাপড় তৈরি হতো ঈদের পরে।

একবার ছোট ভাইয়া বলল, 'আমরা তো ঈদের দিন নতুন কোনো কিছু পরতে পারি না। চল, এবার আমরা বাবার সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়তে যাব না, একা একাও যাব না।'

সেবার শুধু বড় ভাইয়াই বাবার সঙ্গে নামাজ পড়তে গিয়েছিল ঈদের মাঠে। বাবা মাঠ থেকে এসে সেই যে ঘরে ঢুকলেন, সারা দিন আর বের হলেন না, খেলেনও না কোনো কিছু। সংক্রামক রোগের মতো বাবার মৌন ভূমিকায় সংক্রমিত হয়ে মা-ও খেল না কিছু, খেল না বড় আপা, ছোট আপা, ছন্দা; খেলাম না আমরাও। কেবল ছোট ভাইয়া একা একা খাবার বেড়ে নিয়ে, একা একা খেয়ে, পড়তে বসে গেল টেবিলে। কদিন পর তার মেডিক্যাল ফাইনাল।

ঘুমানোর ঠিক আগে আমাদের সবাইকে তাঁর ঘরে ডাকলেন বাবা। ভীষণ ভয়ে ভয়ে আমরা সেখানে গেলাম। ইশারায় আমাদের বসতে বললেন তিনি, আমরা মেঝের ওপর মাদুর পেতে প্রায় গোল হয়ে বসলাম। বসে থাকতে থাকতে সারা শরীর ঘেমে যাচ্ছে আমাদের, কিন্তু বাবা কিছু বলেন না। বেশ কিছুক্ষণ পর খুক করে একটু কেশে বললেন, 'একজন বাবা হিসেবে আমি তোমাদের সব চাহিদা পূরণ করতে পারি না, এ আমার ব্যর্থতা। তোমরা আমার এ ব্যর্থতা মার্জনা কোরো, একজন অক্ষম পিতার অক্ষমতাকে ক্ষমা করে দিও।'

মাথা নিচু করে ফেললেন বাবা। সঙ্গে সঙ্গে বড় আপা প্রায় চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, ছোট ভাইয়া খুব স্বাভাবিকভাবে পড়তে চলে গেল তার টেবিলে, যদিও সেদিন সে কেবল বসেই ছিল, একটা অক্ষরও পড়েনি, বড় ভাইয়া মাথার চুলের ভেতর দু হাত ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ কী যেন দেখতে লাগল মেঝের দিকে তাকিয়ে। ষোল বছর আগের কথা, তবুও স্পষ্ট মনে আছে আমার— আমি সারা রাত কেঁদেছি সেদিন। একটু পরপর বাবার মুখটা ভেসে উঠছিল চোখের সামনে আর আপনা আপনি জল পড়ছিল চোখ দিয়ে।

'রাশেদ।' মা আমার ঘরের দিকে আসছে। আমি দ্রুত বালিশ আঁকড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ি বিছানায়।

ঘরে ঢুকেই মা বেশ অবাক গলায় বলে, 'কি রে, এখনো শুয়ে আছিস! তোর বাবা নাকি আজ ক্লিনিকে যাবে না, মাঝে মাঝে তার কী যে হয়! শরীরটা চেকআপ করানো দরকার। আচ্ছা, তোর শরীর খারাপ নাকি?'

'না।' বিছানা থেকে মুখ না তুলে আমি বলি।

'তাহলে এভাবে শুয়ে আছিস কেন?'

'ভালো লাগছে না, মা।'

মা এগিয়ে এসে আমার পাশে বসে; তারপর পিঠে হাত রেখে বলে, 'দেখি, চিত হয়ে শো তো।'

'না মা, এভাবেই ভালো লাগছে।'

'দেখি তো, কপালটা দেখি, জ্বর-টর এলো কি না।'

সেভাবেই শুয়ে থেকে আমার পিঠে মা'র হাতের ওপর হাত রেখে বললাম, 'মা, আজ বোধ হয় আমার বাজারে যাওয়ার কথা। যেতে ইচ্ছে করছে না।'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পিঠ থেকে হাতটা মাথার চুলে ঢুকিয়ে মা বলে, 'তোর কি মন খারাপ?'

'না।'

'বললেই হলো।' মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে, 'তোকে আমি চিনি না, সেই ছোটকাল থেকে দেখছি, অল্প কিছুতেই তোর মন খারাপ হয়ে যায়। আর মন খারাপ হলেই ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদিস।' একটু কাছ ঘেঁষে মাথার চুলে বেশ জোরে চাপ দিয়ে মা বলে, 'বল না কী হয়েছে তোর?'

মাকে আমি সব কথাই বলি, আপা-ভাইয়ারাও বলে। কারণ মা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধু। এ নিয়ে আমাদের গর্বের কোনো শেষ নেই। আমরা প্রায়ই সুযোগ পেলে সবাইকে জানিয়ে দেই, আমরা হচ্ছি পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান সন্তান, কারণ আমাদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু আছে। আমরা আমাদের সেই বন্ধুকে সব বলি, আমরা আমাদের মায়ের সঙ্গে সব শেয়ার করি।

পাশের বাসায় লিজারা ভাড়া থাকত। আমি তখন নবম শ্রেণীতে আর ও সপ্তম শ্রেণীতে। ওর সঙ্গে আমার কখনো কথা হয়নি। কিন্তু প্রতিদিন বিকেলে ও যখন ওদের ছাদে উঠত, জগতে যত কাজই থাক, যেখানেই থাকি, আমিও তখন ঠিক ঠিক আমাদের ছাদে এসে হাজির হতাম। ছাদে উঠেই আমি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার ভান করতাম, কিন্তু একটু পরপরই আড়চোখে ওর দিকে তাকাতাম এবং প্রতিবারই যারপরনাই হতাশ হতাম। আমি তাকিয়ে থাকি আর লিজা ওদের বিল্ডিংয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে মনোযোগ দিয়ে কী যেন খেলে। ওর এ নিষ্ঠুরতায় আমি মুহূর্তে মুহূর্তে মরে যেতাম, প্রতিটি বিকেল আমার বিষণ্ণতায় ছেয়ে যেত।

চার মাস পর একদিন দেখি, লিজাদের বাসা থেকে সব জিনিসপত্র বের করা হচ্ছে, ওরা চলে যাচ্ছে। প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না কোনো কিছু। কেমন যেন নিস্তব্ধ-নিথর হয়ে গিয়েছিলাম আমি, সমস্ত পৃথিবী যেন একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছিল, সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মনে হয়েছিল পানসে, ক্ষত-বিক্ষত অনুভূতিগুলো বুকের ভেতর মুচড়ে মুচড়ে উঠছিল, গলার কাছটা জমাট বেঁধে গিয়েছিল হাহাকারে। লিজা চলে যাচ্ছে, আমি তাকিয়ে আছি। যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে আছি। লিজা বিন্দু হয়ে মিশে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে ছিলাম, যেন লিজাকে দেখার সাধ এ জনমেও মিটবে না।

লিজা চলে গেল, আর আমি একা হয়ে গেলাম। একাকিত্বের দুঃসহ প্রহরে কোথায় যেন হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল আমার। সেই অবুঝ মনের অসহনীয় অপ্রাপ্তিতে কত দিন কেঁদেছি, কাঁদতে কাঁদতে কত দিন ঘুমিয়ে পড়েছি।

মা একদিন টের পেল। আমার মুখটা তার দু হাতের মধ্যে আলতো করে তুলে উদগ্রীব হয়ে বলল, 'কী হয়েছে তোর?'

কাঁদতে কাঁদতে আমি বলেছিলাম, 'লিজা না চলে গেছে, মা।' তারপর আর কিছু বলতে হয়নি। মায়েরা একদিন কিশোরী ছিল, একদিন আমাদের বয়সী ছিল, মায়েরা সব বোঝে।

কথাটা শুনে হাসতে নিয়েই থমকে গেল মা। আমার চোখের জলে ভিজে গেল তার চোখও। সেই ভেজা চোখ নিয়ে মা হাসতে হাসতে বলেছিল, 'বড় হলে তোকে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেব, লাল টুকটুকে রাজকন্যা।'

মাকে সব বলতাম আমি, মা সব জানত আমার। কিন্তু এখন আর বলি না, বলা হয়ে ওঠে না। আমার মাথায় অলস বিলি কাটতে কাটতে হাত সরিয়ে উঠে চলে যায় মা। আমি উপুড় করা মাথা না তুলেও দিব্যি দেখতে পাই—মায়ের মমতা ঝরানো হেঁটে যাওয়া, অবিশ্রান্ত ভালোবাসা ছড়িয়ে মায়ের চলে যাওয়া।

কিছুক্ষণ পর ধপধপ করে ঘরে ঢুকল ছন্দা। আমি আগের মতোই উপুড় হয়ে শুয়ে আছি, তবু জানি ছন্দা ঢুকেছে ঘরে। কারণ এ বাড়িতে এ রকম শব্দ করে একজনই চলে। সবচেয়ে ছোট, সকলের আদরের তো!

ঘরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে ছন্দা। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে, ও ওর বাঁ হাতের একটা আঙুল মুখে তুলে নিয়েছে, দাঁত দিয়ে সে আঙুলটা ও কামড়াচ্ছে এখন। এগুলো আমার মুখস্থ, ছন্দার প্রায় সব ছন্দই আমার জানা।

'ছোট ভাইয়া...।' কিছুটা শঙ্কিত, কিছুটা বিব্রত গলায় ছন্দা ডাকল।

'বল।' শান্ত গলায় আমি বলি।

'তুই কী আমার ওপর রাগ করে আছিস?'

'কেন?'

'বারে, সকালে চা চাইলি আমার কাছে, বানিয়ে দিলাম না যে!'

'না, রাগ করিনি।'

'ভাইয়া, তুই তো আগামী মাসেই চাকরিতে জয়েন করছিস?'

'হ্যাঁ।'

'তুই কিন্তু আমাকে একটা কথা দিয়েছিলি।'

'কী কথা রে?'

'বারে, এর মধ্যে ভুলে গেলি! তোকে বললাম না আমি কিছু টাকা জমিয়েছি, তুই চাকরির প্রথম বেতন পেয়ে আমাকে কিছু টাকা দিবি, আমি একটা

মোবাইল কিনব।'

'ঠিক আছে দেব।'

ছন্দা দ্রুত দৌড়ে এসে আমার পাশে বসে। একটা হাত ধরে বলে, 'থ্যাংকু, ভাইয়া।'

স্পষ্ট মনে আছে আমার, একদিন মায়ের কাছে জামা বানানোর টাকা চেয়েছিল ছন্দা, ওর বান্ধবীরা সবাই কী এক কাপড়ের একই রকম জামা বানাবে, সুতরাং ও-ও বানাবে। মা টাকা দিতে পারেনি। কয়েক দিন ও শুধু কেঁদেছিল। ওর কান্না দেখে আমারও সে কী কান্না!

'ভাইয়া শোন', ছন্দা একটু থেমে বলে, 'ভাইয়া, তুই কি শুনছিস?'

'হ্যাঁ বল।'

'আজকের দিনটা কি তোর মনে আছে?'

'কেন, আজ কি কারো জন্মদিন?'

'না।'

'তাহলে?'

'তোর সত্যি মনে নেই?'

'না।'

'কয়েক বছর আগে এই দিনটায় আমরা সারা দিন না খেয়ে ছিলাম। মা কী যেন একটা অসুখে পড়েছিল, পুরো মাসের বেতনসহ বাবার সামান্য যা জমানো টাকা ছিল সব শেষ হয়ে গেল মায়ের চিকিৎসার পেছনে, শেষে বড় ভাইয়া মাস শেষ হওয়ার আগেই তার টিউশনির টাকা চেয়ে আনল তার ছাত্রীর বাসা থেকে, তারপর বাজার এবং আমাদের খাওয়া-দাওয়া।'

'তুই মনে রেখেছিস সে দিনের কথা!'

'ভুলেই তো গিয়েছিলাম।'

'হঠাৎ মনে হলো কীভাবে?'

'বলব?'

'হ্যাঁ, বল।'

'কথা দে আর কাউকে কিছু বলবি না এ বিষয়ে।'

'বলব না।'

'মা না প্রতি বছর এই দিনটায় সারা দিন না খেয়ে থাকে, আজও না খেয়ে আছে।'

বিছানা থেকে আস্তে করে উঠে বসলাম আমি। ছন্দা একটু সরে এসে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকায়, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে, 'ভাইয়া, তুই কাঁদছিস?' আমি হাত দিয়ে ইশারা করে ওকে থামানোর আগেই ও আবারও চিৎকার করে মাকে বলে, 'মা, দেখে যাও ছোট ভাইয়া কাঁদছে।'

দ্রুত দৌড়ে এলো মা আমার ঘরে, এসেই আমার ডান হাতটা প্রায় খামছে

ধরে বলে, 'তোর কী হয়েছে রে, রাশেদ?'

চোখ মুছতে মুছতে আমি বলি, 'কিছু না, মা।'

'কিছু না মানে! তাহলে কাঁদছিস কেন?'

'এমনি।' একটু থেমে আমি বলি, 'বড় ভাইয়ার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম একদিন, কদিন আগে করলাম ছোট ভাইয়ার সঙ্গে। তোমার মনে আছে, বড় ভাইয়া একবার বেশ কয়েক দিনের জন্য আমাদের ছেড়ে কোথায় যেন একটা চাকরিতে গিয়েছিল। ভাইয়া চলে যাচ্ছে, আমাদের সবার মন খারাপ, আর আমি তো কেঁদেই অস্থির। মন খারাপ ছিল ভাইয়ারও, তাই তো মাত্র কয়েক দিন পরেই চাকরি ছেড়ে ভাইয়া চলে এলো আমাদের কাছে। এই আকালের বাজারে চাকরি ছেড়ে চলে এলো, এতে আমাদের মন খারাপ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেদিন আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। বাবা তো তখনই বাজারের ব্যাগ নিয়ে চলে গেলেন বাজারে, বড় ছেলের জন্য ভালো কিছু বাজার করতে। সেই বড় ভাইয়া এখন তার বৌ নিয়ে আমাদের ছেড়ে অন্যত্র দিব্যি সংসার করে খাচ্ছে, তার জন্য আমাদের এখন আর তেমন কষ্ট হয় না। পরশু দিন ছোট ভাইয়াও আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে বদলি হয়ে, সঙ্গে ছোট ভাবীও। বড় আপা, ছোট আপা বিয়ে করে নিজেদের সংসারের মাঝে ভুলে গেছে আমাদের কথা। একদিন হয়তো আমিও চলে যাব।'

মা তার আঁচলটা মুখে চেপে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'চলে যাবার সময় হলে যাবি।'

দু হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরি আমি। ছন্দার চোখ পানিতে ভরে গেছে। আমি একটু সোজা হয়ে মাথাটা নিচু করে বলি, 'মা...,' থেমে যাই আমি। গলা দিয়ে কথা বের হতে চায় না আমার।

মাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলি, 'তোমাকে বরং একটা গল্প বলি। তারার গল্প। সপ্তর্ষি, লুব্ধক কিংবা শুকতারা নয়। ক্ষয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, খসে পড়া কোনো নাম না জানা তারার গল্প!

শুনবে না!

অনুভবের গল্প শুনবে?

একটু একটু করে বেড়ে ওঠা ভ্রূণ যখন গর্ভের নিশ্চিন্ত আঁধারেই হাত-পা ছুড়ে জানান দেয় নিজের অস্তিত্ব, তখন রক্তের কাঁপুনি কি বুঝতে পারে কোনো মা?

তবে কী করে আমি তোমাকে অনুভবের গল্প শোনাই, বলো?

হায়! রংধনুর গল্পও যে শোনাব, সে সাধ্য আমার কই! নাগরিক বাতাসে এত বেশি সীসা যে, নীল আকাশই দেখা হয় না আজকাল।! ধূসর আকাশটা ছেয়ে গেছে আজ বিষাক্ত ধোঁয়ায়।

আচ্ছা মা, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, ক্রমাগত নিছক প্রয়োজনের পেছনে

ঘুরে আমরাও কি ধূসর হয়ে যাচ্ছি না ক্রমশ? রংধনুর গল্প আমাদের প্রত্যাশা হয়ে বেঁচে থাক।

বরং রূপান্তরের গল্প শোনাই তোমাকে। স্বপ্ন কিংবা মানুষের। কিংবা দুটোরই। স্বপ্ন যখন মানুষের গন্তব্য অথবা মানুষই যখন স্বপ্নের আধার।

চোখ বুজলেই দু চোখে স্বপ্ন এসে হানা দেওয়ার বয়স পেরিয়েছি সেই কবে! শৈশবে আর ফেরা যায় না, তাই না? এখন স্বপ্নহীন রাতগুলো বড় বেশি দীর্ঘ। কোথায় হারায় স্বপ্নগুলো? মানুষগু কেন এমন বদলে যায়—রাতের পর রাত?

আমাদের বুকের ভেতর মমতা থাকে, আমাদের একে অপরের এক টুকরো মমত্বও যেন হারিয়ে না যায় তার প্রতি থাকে আমাদের প্রগাঢ় অনুভব, আমাদের প্রতিটা মুহূর্ত জ্বলজ্বল করে আমাদের আত্মিকতায়, আমাদের পরস্পর অস্তিত্বের গোপন কোটরে আমরা পরস্পর বাস করি। আমরা বড় হই, বড় হয়ে যাই, আমরা হারিয়ে ফেলি আমাদের সুকুমার অনুভূতি, বিসর্জন দেই মানবিক মূল্যবোধ, আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই নিজেদের অস্তিত্ব থেকে। কোনো কিছু দেখে এখন আর আমাদের কষ্ট হয় না, কোনো দুঃখে মুচড়ে ওঠে না বুকের ভেতর, আগের মতো আর কাঁদতে পারি না—আমি অথবা আমরা।

ধ্যাত! এসব কী গল্প বলছি তোমাকে!

তোমার সাথে আমার যে গল্প, আমাকে নিয়ে যে গল্প, সে তো খসে পড়া তারারও নয়, হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নেরও নয়। সে তো রূপান্তরিত আত্মার গল্প, আগের মতো কাঁদতে পারি না কেন সেটা মনে করে আজকে আমার এ কাঁদার গল্প—মানুষ থেকে যন্ত্র হওয়ার গল্প।'

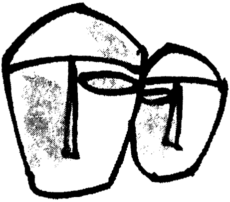

দ্বন্দ্ব

সন্ধ্যার উলুধ্বনি আর ধূপের গন্ধে কাকিমা স্রষ্টার সন্তুষ্টিতে ব্যস্ত।

জায়নামাজে সন্ধ্যার নামাজ আর তসবি নিয়ে মা স্রষ্টার বন্দনায় মগ্ন।

ফজরে বাবার মসজিদে যাত্রা আর কীর্তনভজনে কাকাবাবু—এরা পরস্পর প্রতিবেশী, আপনজন, নিকট মানুষ, সুখ-দুঃখের কথোপকথন।

প্রত্যুষের প্রথম সাক্ষাতে কাকাবাবু ব্যানার্জি মশাই, বাবা খান সাহেব, মা-ভাবী আর কাকিমা-বৌদি। সম্বোধনের কুশলবার্তা।

বাবা খুব আন্তরিক গলায় জিজ্ঞাসা করেন, 'ব্যানার্জি মশাইয়ের শরীরটা কেমন?'

বিনয়ী একটা হাসি দিয়ে কাকাও জিজ্ঞাসা করেন, 'খান সাহেব, আপনার বাতের ব্যথাটা কমেছে?'

তারপর শুরু হয় জগৎ-সংসারের নানান কথা—সমাজ, রাজনীতি, মানুষ, পরিবেশ। পরস্পরের দুঃখে দুজন দুঃখী হন, সুখে সুখী হন।

সবশেষে বাবা কাকাবাবুর কাঁধে বিনয়ী হাত রেখে বলেন, 'খোদা আপনাকে ভালো রাখুন।'

কাকাবাবু বাবার দু হাত খুব ভক্তি সহকারে নিজের দু হাতের মুঠোয় নিয়ে বলেন, 'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

কাকিমা প্রায়ই নারকেলের নাড়ু বানিয়ে মাকে দিয়ে যান, নাড়ু খুব পছন্দ করে মা।

মা যখনই কোনো পিঠা বানায়, দিয়ে আসে কাকিমাকে, মার হাতের পিঠা নাকি অপূর্ব।

বছরের কোনো ফল এ-বাড়িতে প্রথম এলে ও-বাড়িও তার স্বাদ পায়। ও-বাড়িতে ভালো কিছু রান্না হলে চলে আসে তা এ-বাড়িতেও। ভালোমন্দের প্রায় সবকিছুই এখানে হলে ওখানে যাবে, ওখানে হলে এখানে আসবে।

তারপর কত কথা—শাড়ি, ব্লাউজ, সিনেমা, গয়না। কোনো কোনো বিকেলে বসে একে অপরের চুল আঁচড়ানো, খোঁপা বাঁধা, এর-ওর কথা বলা।

মিনুদি কোনো সমস্যা হলেই ছুটে আসে মেজপার কাছে। মেজপা খুব মনোযোগ দিয়ে মিনুদির কথা শোনে। নিচু গলায় কী যেন বলে একে অপরকে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে দুজন। বাজারে কোনো নতুন জামা এসেছে কি না, ওই কাপড়টার দাম এখন কত, মেলানো যাচ্ছে না জামদানি ওড়নার রঙ, ওই ছেলেটা কেমন যেন ক্যাবলা ধরনের, জানিস ওই সিনেমাটা না কী সুন্দর! আরো কত কথা।

মেজপা খুব ভালো জামা বানাতে পারে, মিনুদি তাই কাপড় কিনে সোজা ছুটে আসে মেজপার কাছে। মিনুদি খুব সুন্দর করে সাজাতে পারে, বাইরে কোনো অনুষ্ঠান থাকলেই মিনুদি তাই সাজিয়ে দেয় মেজপাকে।

কখনো দুজন একই রকমের জামা পরে, একসঙ্গে কোনো অনুষ্ঠানে যায়, কথা বলে সারাক্ষণ, শেষ হয় না তা সারা দিনেও।

এভাবে নিত্যদিন। গলায় গলায় প্রতিদিন।

এরই মাঝে একদিন।

ওপারে একদিন মসজিদ ভাঙে—বাবার মুখ কালো। তিন দিন হয় না কুশল বিনিময়।

আবার এপারে কোনো দিন মন্দির ভাঙে—কাকাবাবু তিন দিন অন্তর্ধান।

বিষণ্ন মুখে মা বসে থাকে বারান্দায়, কী যেন ভাবে আর ফিরে তাকায় বাড়ির গেটের দিকে। কাকিমা এমনি এমনি তাদের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ, আমাদের বাড়ির দিকে করুণ চোখে কী যেন দেখে।

মিনুদির পায়ের চপচপ শব্দে আমাদের উঠোন আর কাঁপে না, জড়িয়ে ধরে না মেজপাকে।

বাইরে যাওয়া মেজপা প্রায় ভুলেই যায়, মিনুদির কাছে সাজতে যাওয়া হয় না এখন।

দু পারের সংখ্যালঘুর চিন্তায় দু পরিবারই দুঃখী, একই রকমের দুঃখী। দূরের বাঁশির করুণ সুরে নিজেদের আনন্দবাঁশি থামিয়ে ফেলে।

এরপরও আরো অনেক দিন।

কাকাবাবু আর বাবার সাক্ষাৎ-আলাপ। মা-কাকিমা অলস আড্ডা, মিনুদি-মেজপার চুপিচুপি কথা।

কিন্তু নিস্তব্ধ নিঝুম, কেমন জানি।

কেমন যেন শোকার্ত এক পরিবেশ, বিবর্ণ।

বিবর্ণ চোখ, ক্ষত-বিক্ষত অনুভূতি।

একরাশ মৌন বাতাসে মনে হয় এ সবই ঠুনকো আবরণ, অনাত্মীয় কুশল আর মেকি সহমর্মিতা।

বাহির-ভেতর, মিল-অমিল, শুভ্র আত্মার শুদ্ধ আলো ঢেকে যায় শঙ্খনীল বিষের ধোঁয়ায়।

কিন্তু না।

বাবার পাঁজরে থাক কাকার পাঁজর। খুব অদ্ভুত গলায় বাবা কাকাকে বলছেন, ব্যানার্জি মশাই, মসজিদ-মন্দির যা-ই ভাঙুক, আমাদের বুক ভাঙেনি। আমাদের যে বুক আছে, যে আত্মা আছে, আত্মাগুলো মানুষ খোঁজে মানুষ হওয়ার প্রত্যাশ্যায়।

কাকিমার বাহুবন্ধন হোক মার বন্ধন, এক হৃদয়ের সুখ-দুঃখগুলো মিশে মিশে যাক অন্য হৃদয়ে, সৌন্দর্যের ফুল ফুটুক বুকের মাঝে।

সকল কালো দূর হয়ে যাক আগুনঝরা বর্ষণে, সাম্প্রদায়িকতা ধ্বংস হোক অসাম্প্রদায়িকতার উচ্ছ্বাসে—গভীরে, আত্মায়, মমতায়, সত্যতায়।

সে বহুক্ষণের, সে অশেষ ক্ষণের।

কিন্তু...।

দিন চলে যায়, বেলা বয়ে যায়।

একটি এক পাওয়ালা কাক এবং আমি

কাকটি প্রতিদিন দুবার আসে। সকাল এবং বিকালে। সকাল ঠিক সাড়ে সাতটায় এবং বিকাল ঠিক পাঁচটায়। প্রায় সাত-আট মাস হলো এমন হচ্ছে। সময়ের একটুও হেরফের হয় না। মনে হয় তার একটা অদৃশ্য ঘড়ি আছে, তা-ই দেখে সে আসে। প্রতিদিন আসে। একই সময়ে।

একটা বৈশিষ্ট্য আছে কাকটির। তার একটি পা নেই। এক পা নিয়ে সে যেন ছন্দের তালে লাফিয়ে হাঁটে। নিদারুণ যন্ত্রণা আর কষ্ট নিয়ে এভাবে সে হাঁটলেও, আমার অসম্ভব ভালো লাগে তার এ পথচলা। ভীষণ মুগ্ধ হয়ে প্রায়ই আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

প্রথম প্রথম বেশ বিরক্ত হতাম। সকালে কিছু খাচ্ছি তো কাকটি এসে হাজির। কিছু খাবার ছিটিয়ে দিতাম ওকে। আপন মনে কিছু খেত আর কিছু নিয়ে উড়ে যেত অন্য জায়গায়।

ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ওর। সকালে ঘুম থেকে উঠে ওর কথা মনে হয়। আমাদের একতলা বাড়ির ছাদের এই ঘরটায় আমার একাকিত্বের সঙ্গী হিসেবে সে বেশ ভালো বন্ধু হয়ে যায়। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে যখন ক্লান্তি এসে যায়, তখন ওর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করি। 'মামা, কেমন আছো?' ও কোনো উত্তর দেয় না। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আর মাঝে মাঝে গলা দিয়ে 'কড়-ড়-ড়' শব্দ করে। আমার বেশ ভালো লাগে। আমি আবার বলি, 'মন-শরীর দুটোই ভালো?' ও এবার শব্দ করে কা কা করে ওঠে। আমি হেসে ফেলে বলি, 'বেশ, বেশ।'

মাঝে মাঝে মা হঠাৎ ছাদে এসে আমার সঙ্গে ওর কথা বলা দেখে ফেলে। চোখ দুটো বড় বড় করে মা তখন কৌতুকের স্বরে বলে, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস?' আমি হেসে ওকে দেখাই। মায়ের হাসি-হাসি মুখটা কালো হয়ে যায়। বলে, 'তোর খুব কষ্ট হয় রে বাবু, না?' আমি আমার সমস্ত কষ্ট লুকিয়ে ফেলি মুখের অপূর্ব হাসিতে।

হাসি খুব ভালো একটা ব্যাপার। আমার হাসিটা নাকি আসলেই খুব অপূর্ব। কলেজের সহপাঠীরা তো বলতই, নীতু আরো বেশি বলত। আমার হাসির জন্যেই নাকি ও মজেছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় বাবা অফিস থেকে ফিরে ছাদে আসে। তারপর সামান্য কাশির শব্দ করে আমার ঘরে ঢোকে। শোয়া অবস্থায় থাকলে ওঠার চেষ্টা করি। বাবা আমাকে উঠতে সাহায্য করে। খাটের স্ট্যান্ডের সঙ্গে বালিশটা রেখে আমার পিঠটা ঠেকিয়ে দেয়। আমি হাঁফাতে হাঁফাতে আরাম করে হেলান দিয়ে বসি। তারপর বাবা আমার পাশে বসে প্রতিদিনের মতো মাথায় হাত রেখে বলেন, 'পা দুটোর অবস্থা কেমন, বাবু?' একই উত্তর প্রতিদিন দিতে আমার আর ভালো লাগে না। প্রসঙ্গ পাল্টাতে আমি বাবাকে বলি, 'তোমাকে আজ খুব স্মার্ট লাগছে, বাবা।' বাবা তার মুখে বেদনার হাসি টেনে বলেন, 'পাগল কোথাকার।' আমি বাবার ফর্সা মুখের নীলচে শেভের ধারাগুলো দেখি। বাবা আমার মাথায় হাত বুলাতে থাকে।

গল্প করতে করতে বাবার সঙ্গে আর গল্প করার কোনো কথা খুঁজে পাই না। প্রতিদিন একই রকম। সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠা, একা একা হুইল চেয়ারে বসে পাশের বাথরুমে যাওয়া, কাকের সঙ্গে কথা বলা, মায়ের সকালে খাবার আনা, তার দুঃখের কথা শোনা, বিকেলে কাক, সন্ধ্যায় বাবা, হতাশ চেহারা, রাত্রি, ঘুম আবার সকাল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চুপচাপ। বাবা আমার মাথায় হাত রেখে কি যেন ভাবছে। আমি জানি বাবা কী ভাবছে। বাবার ভাবনার তালিকায় প্রতিদিনের আরো নতুন নতুন ভাবনা যোগ হচ্ছে। এটা আমি টের পাচ্ছি। ভাবনা ছাড়া একজন সুস্থ মানুষ এই পৃথিবীতে আছে কি না, তা আমার বড্ড জানতে ইচ্ছে করে। বাবার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে বলি, 'বাবা, গভীর কিছু ভাবছ বোধ হয়?'

'না, তেমন কিছু না।' বাবার অস্পষ্ট জবাব।

'ছোট্ট এই জীবনে এত ভেবে কী লাভ, বাবা?'

'ভাবনা যে আসে।'

'ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দাও।'

'পারলে তো ভালোই হতো।'

'চেষ্টা করো।'

বাবা কোনো কথা বলে না। আমি বলি, 'বাবা, তোমাকে একটা কাজের কথা বলি?'

বাবা মুখটা উঁচু করে বলে, 'বলো।'

'আচ্ছা কষ্টমষ্ট করে এই ছাদের ওপর দোতলাটা কমপ্লিট করলে কেমন হয়?'

'ভালোই হয়।' বাবার মুখে রসিকতার হাসি।

'তা করছ না কেন, করলে তো ভাড়া দেয়া যেত?'

কথাটা বলেই বুঝতে পারলাম বোকার মতো কাজ করেছি। মান্ধাতার আমলের এই একতলা বিল্ডিংটা বাবা তার পৈতৃক সূত্রে পেয়েছেন। বহু বছরের বিল্ডিং, চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথা। একতলারই নড়বড়ে অবস্থা। দোতলা করলে আর রক্ষা নেই, একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। আজকাল এই এতটুকু জায়গা কিনতেই যা দাম, তার ওপর আবার বাড়ি করা। আমরা ভাগ্যবান যে আমাদের একটা বাড়ি আছে। অন্যদের অবস্থা তো আরো খারাপ। ছোটখাটো একটা সরকারি চাকরি করে আর কী করা যায়! মা তো প্রায়ই বাবাকে বলে, 'তোমার ঘুষ-টুষের ব্যবস্থা নেই?'

বাবা হেসে বলে, 'আছে।'

'তা নাও না কেন?'

'কে বলল নিই না?'

'নিলে তো সংসারের এ অবস্থা হতো না।'

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। আমি বুঝতে পারি বাবার এখন প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। বাবা এখন ঘন ঘন তার মাথায় হাত বুলাবেন আর চুল টানবেন। তারপর শেষে উত্তেজিত হয়ে মাকে বলবেন, 'মমতা, এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দাও।' একটু পানি খেয়ে বাকি পানিটুকু বাবা নিজের গায়ে ঢেলে দিবেন। তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়বেন।

মা অপরাধীর মতো গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে কাতর স্বরে বলে, 'আমাকে ক্ষমা করো।'

মায়ের এই কাতরতায় বাবা কী মজা পায় জানি না, হাসতে হাসতে বলে, 'মমতা, সংসারে সৎ থাকার মতো কঠিন জিনিস আর নেই। যে লোভ ত্যাগ করতে পারে, সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। আমি সুখী হতে চাই, মমতা।'

মা বাবার মাথায় হাত বুলাতে থাকে। মা-বাবার এই আবেগের পর্বটা দেখতে আমার বেশ লজ্জা লাগে। আমি আমার চোখ দুটো সরিয়ে নিয়ে মাথা নিচু করে ফেলি।

কাকটি এসেছে। আমি জানি, এখন পাঁচটা বাজে। ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে আমি সিওর, এখন পাঁচটাই বাজে। মনকে প্রবোধ দেয়ার জন্য ঘড়ির দিকে তাকাই, যা ভেবেছি তা-ই, পাঁচটা।

মায়া-মায়া ভাব নিয়ে কাকটা তাকিয়ে আছে। আমিও ওর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলি, 'আজ কেমন আছ, মামা?' ও কিছু বলে না, শুধু ঘাড়টা কাত করে আমাকে ভালোভাবে দেখে। আমি আরো একটু জোরে বলি, 'কী ভালো তো?' ও এবার ওর একমাত্র পাটা উঁচু করে লাফ দেয়। আমি বুঝে নেই ও ভালো আছে।

টেবিলের ওপর থেকে বিস্কুট আর মুড়ির কৌটাটা নিতে আমার বেশ কষ্ট হয়। খাটের এপাশে বসলে, বেশ ঘষতে ঘষতে ওপাশে টেবিলের কাছে যেতে হয়। আমি হাঁফাতে থাকি। কিছুক্ষণ পর কৌটাটা খুলে আমি একটা বিস্কুট নিয়ে ওর দিকে ছুড়ে দেই। ও বিস্কুটটা মুখে নিয়ে মাথাটা কাত করে একবার এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর ঠুকরিয়ে ছোট টুকরো করে বিস্কুটটা খেয়ে ফেলে। বিস্কুটটা শেষ করেই ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি এবার ওর দিকে মুড়ি ছুড়ে দেই। কিছু মুড়ি ঘরের ভিতর পড়ে, কিছু বাইরে যায়। কাকটা মুড়ি খেতে খেতে আমার ঘরের ভেতর চলে আসে। এই সময়টিতে সবচেয়ে কাছ থেকে আমি ওকে দেখি। কী সুন্দর কালো রঙ। সারাক্ষণ চিকচিক করে। কালোরও একটা সৌন্দর্য আছে, তা ওকে দেখে বোঝা যায়। আমি বলি, 'মামা, একটু কাছে আসো।' ও বোঝে না। একটু পরে উড়ে চলে যায়।

ছাদের উপর মৃদু একটা শব্দ হতেই দেখি কান্তা এসেছে। খুব চুপিচুপি ও ছাদে আসে। কেন যেন ও ওর ছাদে আসাটা আমাকে জানাতে চায় না। তাই ও ছাদে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি চোখ বুজে পড়ে থাকি। ও জানুক আমি ওকে দেখিনি।

ছাদের পশ্চিমের কোনাটিতে দাঁড়ায় ও প্রতিদিন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে কী যেন খোঁজে। বেশ কিছুক্ষণ পর ওর মুখে হাসি দেখা যায়। তারপর চোখ দিয়ে এবং হাত নেড়ে ইশারায় কার সঙ্গে যেন কথা বলে। এ সময় কান্তাকে খুব সুন্দর লাগে। সারা মুখে হাসি, উচ্ছল একটা ভাব সারা শরীরে। নীতু যখন আমার সঙ্গে কথা বলত, তখন ওর মুখেও এমনি হাসি আর সারা শরীরে উচ্ছলতা ঝরে পড়ত। তবে কি কান্তা কারো প্রেমে পড়েছে? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে হুইল চেয়ারটা নিয়ে ছাদের রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে যাই। ইদানীং বিকেলে স্কুল থেকে ফিরেই বোধ হয় কান্তা নতুন করে আবার সাজতে বসে। ওর ক্লান্তি লাগে না? প্রেমে পড়লে আসলে মানুষের ক্লান্তি আসে না।

মাগরিবের আজানের একটু আগে কান্তা নিচে নেমে যায়। প্রতিদিন যায়। আজানের সময় ছাদে থাকা নিষেধ, মায়ের আদেশ। আজও যাচ্ছিল। আমি ডাকলাম। ও বোধ হয় একটু চমকে উঠল। ভীত কণ্ঠে বলে, 'ভাইয়া, তুমি ঘুমাওনি?'

'হ্যাঁ।'

চোখ দুটোতে ভয়ের ছায়া এনে বলে, 'কখন উঠেছ?'

প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বলি, 'লেখাপড়া কেমন চলছে রে?'

ও মাথা কাত করে মৃদু স্বরে বলে, 'ভালো।'

'বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, ভেতরে আয়।'

'এখন আজান দিবে যে, আজানের সময় তো আবার ছাদে থাকা মার

নিষেধ।'

আমার সামনে থেকে ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে চায়। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি ওকে বলি, 'তাহলে যা।' ও দ্রুত চলে যায় আমার সামনে থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ হলো সন্ধ্যা হয়েছে। বাবা আজ দেরি করছে। এখনো আমার কাছে এলো না। কথাগুলো ভাবার সঙ্গে সঙ্গে, বাবা সামান্য কেশে ঘরে ঢুকলেন। বাবার সারা মুখে ঘাম। বললাম, 'বাবা, এত ঘেমেছ কেন?'

'বাজার করতে হলো রে।'

'মিন্টু তো বাজার করতে পারে।'

'ওর বাজার আবার তোর মায়ের পছন্দ হয় না। আজেবাজে জিনিস বেশ দাম দিয়ে নাকি কেনে।'

আমি হেসে ফেলি। ছাত্র অবস্থায় দু-চার টাকা কামাইয়ের ব্যবস্থা বাজার করা থেকেই হয়ে থাকে। মিন্টুটাও যে এ থেকে পিছিয়ে নেই, তা ওর বেশ দাম (!) দিয়ে জিনিস কেনা থেকেই বোঝা যায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলেদের এ ছাড়া কোনো ব্যবস্থাও তেমন নেই।

'একটা খবর আছে রে, বাবু।' বাবার চোখ দুটো উৎফুল্ল।

'কী, বাবা?'

'জার্মানি থেকে একদল চিকিৎসক নাকি বাংলাদেশে আসছে। পক্ষাঘাত রোগীদের নাকি চিকিৎসা করবে ওরা। ফ্রি চিকিৎসা। আমি তোর জন্য ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি।'

'কী হবে বাবা এটা করে?'

'চেষ্টা করতে দোষ কী?'

'কোনো ফল হবে না, বাবা।'

বাবা কিছুক্ষণ চুপ থাকে। তারপর গভীর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'সামান্য জ্বর থেকে যে এমন হয়, তা কোনো দিন শুনিনি। তোর যখন প্রথম হলো, তখন অনেকেই বলল সিঙ্গাপুর-টিঙ্গাপুরে গেলে নাকি তুই ভালো হয়ে যাবি। সব চিকিৎসা শেষে ডাক্তাররাও এ কথা বলল। কিন্তু...।' বাবার চোখ দুটো টলমল করে ওঠে। 'আসলে আমি পরাজিত রে, বাবু। জীবনের সব ক্ষেত্রে আমি পরাজিত। না তোর মাকে সুখী করতে পারলাম, না তোদের। ইদানীং আমার কী মনে হয় জানিস, পৃথিবীতে কেউ কেউ শুধু পরাজিত হবার জন্যই জন্মায়।'

আমার চোখেও জল এসে যায়। খুব কষ্টে তা ঠেকিয়ে বাবাকে বলি, 'কে বলল বাবা তুমি পরাজিত। জানো বাবা, যখন মনে হয় আমার বাবা একজন সৎ মানুষ, তখন গর্বে বুকটা ভরে যায়। কষ্টগুলো যেন কোথায় উড়ে যায়।'

অনেকক্ষণ বাবা মাথা নিচু করে থাকে। আমি বাবার একটা হাত ধরি। মুখে

হাসি এনে বলি, 'আমার এমন অবস্থা হলেও মিন্টু তো রয়েছে। তুমি দেখো, ও ঠিক মানুষ হবে।'

'সে আশা নিয়েই তো বেঁচে আছি।'

'বাবা, তোমাকে আর একটা কথা বলি।'

'বলো।'

'কান্তাকে কি এখন বিয়ে দেয়া যায়?'

'এ কথা বলছিস কেন, ও তো কেবল ক্লাস টেনে পড়ে। তাছাড়া বিয়ে দিতেও অনেক টাকা লাগে রে, বাবু। মিনিকে বিয়ে দেয়ার সময় যে গলার মালাটা দিতে চেয়েছিলাম, তা এখনো দেয়া হয়নি। মিনি চিঠি লিখেছে, জামাই নাকি ওই গয়নার বদলে ব্যবসার জন্য দশ হাজার টাকা চেয়েছে।'

বাবা আর কথা বললে না। আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে চলে যায়। একটু কুঁজো হয়ে বাবার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে আমার চোখে পানি এসে যায়।

কয়েক দিন হলো কাকটি আসছে না। প্রতিদিন চিন্তা করি। কী হলো কাকটির? মরে গেল না তো? মনে একটু ভয়ও জাগে। মায়াও হয় বেশ। যদিও সাড়ে সাতটা বাজতে আরো কয়েক মিনিট বাকি। আজ আসতে পারে। মন বলছে।

মা আজ বেশ সকালে নাস্তা নিয়ে এসে হাজির। প্রতিদিনের মতো মায়ের মুখে আজ কেন যেন হাসি নেই। আমি আশ্চর্য হয়ে বলি, 'মুখটা অমন করে রেখেছ কেন, মা?'

'মিনি এসেছে।'

'বেশ তো, দুলাভাই আসেনি?'

'না। তবে মিনির এ আসা সে আসা নয় রে, বাবু!'

'কী বলছ, মা?'

'হ্যাঁ, ও জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে।'

মায়ের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আমি বলি, 'মা, ও কি কোনো টাকা-পয়সার কথা বলেছে?'

'হুঁ।'

'ঠিক আছে। বাবাকে বলো কষ্টমষ্ট করে যেভাবেই হোক টাকাটা দিয়ে দিতে?'

'সে কথাই আমি ভাবছি।' বলে মা চলে গেল।

খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকি। খেতে ইচ্ছা করে না। একটু শুয়ে থাকলে ভালো লাগবে। শোয়ার জন্য যেই কাত হয়েছি ঠিক তখনই কা কা শব্দে ফিরে তাকায়। কাকটা এসেছে। একা নয়, সঙ্গে দুটো ছোট কাক। ওর বাচ্চা।

অনাবিল আনন্দে মনটা ভরে যায় আমার। এক পা নিয়ে লাফাতে লাফাতে কাকটি আমার কাছে আসে। পেছনে পেছনে ওর বাচ্চা দুটোও। আমি ওর দিকে তাকাই। ওর চোখ দুটো যেন হাসছে আর বলছে, 'মামা, দেখো আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছি।'

নীতুর কথা হঠাৎ করে মনে হলো। আমার পায়ের এ অবস্থা হওয়ার পর ও একদিন বলেছিল, 'মানুষের এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।' তারপর ও আর আমার কাছে কোনো দিন আসেনি। সেদিন ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। সত্যি সত্যি মরে যেতে ইচ্ছে করছিল সেদিন।

কবির নামে আমার এক বন্ধু আছে। ভীষণ ঠোঁট কাটা। কথা বলে গুছিয়ে গুছিয়ে, কিন্তু সরাসরি। ভালো-মন্দ সব কথাই ও স্পষ্টভাবে বলে দেয়। লুকায় না কোনো কিছুই। নীতুর ওই কথাটা একদিন ওকে বলায়, ও মাথা নিচু করে বসে ছিল অনেকক্ষণ। কিছুক্ষণ পর বলল, 'একটা মানুষ আর একটা প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য কী জানিস? একটা খোঁড়া প্রাণী স্বামী-বউ কিংবা বাবা-মা হওয়ার যোগ্যতা রাখে, কিন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হয়েও একজন পঙ্গু মানুষ সে যোগ্যতা রাখে না।'

অনেক দিন পর আজ আবার কথাটা মনে পড়ে। বুকের ভেতর কেমন যেন করতে লাগল। কষ্টের বুদবুদটা বাড়তে চাচ্ছে। বাচ্চাসহ কাকটির এ ফিরে আসায় আনন্দে ভরে গেছে মনটা। মন ভালো হলে কষ্ট ভোলা যায়। আমিও ভুলে যাই। বাবা একদিন বলেছিলেন, 'মানুষের মহৎ একটা গুণ আছে যেটা প্রাণীদের নেই—ক্ষমা করার গুণ।' আজ তাই আমার সমস্ত কষ্ট একপাশে সরিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দিই নীতুকে।

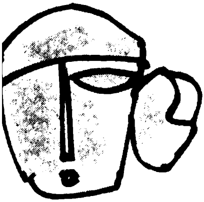

বর্ণচোরা

মেজাজটা খিঁচিয়ে ওঠে আমার। বেশ দেরি হয়ে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয় আজিজ, বিনয়, পিপলু শুরু করে দিয়েছে। রাগে মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। যদি ওরা শুরু করে থাকে—না, এটা ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

শালা, বাসে এত ভিড়। হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি। এ ওকে গুঁতো মারে, সে তাকে গুঁতো মারে। কার আগে কে উঠবে—সেই প্রতিযোগিতা। মন্দ না। মাঝে মাঝে মনে হয়, দু-একজনকে দেই ফেলে লাথি মেরে,। এ রকম অন্যেরও মনে হতে পারে আমাকে লাথি মেরে ফেলে দিতে। মানুষ প্রথমে নিজের কথা ভাবে, এটা তার প্রবৃত্তি।

কোনোরকমে বাসে উঠে রডটা ধরে দাঁড়াই। অফিস টাইমের এই ভিড় সহ্য হয়ে গেছে। না হয়ে উপায় আছে! মানুষের সবকিছু এক সময় সহ্য হয়ে যায়। মশার অবিরত গুনগুনানী, ওয়াসার কেঁচো মিশ্রিত পানি, রাস্তার কালো ধোঁয়া, স-ব।

দুপাশ থেকে দুটো লোক চেপে ধরেছে। কৌশলে কনুই মেরে আমি শক্ত হয়ে দাঁড়াই। বাম পাশের লোকটা রাগী চোখে তাকায়। বাম চোখের কোনা দিয়ে তার রাগী চেহারাটা দেখে সামনের দিকে তাকাই আমি। যেন কিছুই হয়নি। পরক্ষণেই ভদ্রলোকটি তার ডান পা দিয়ে আমার বাম পাটা চেপে ধরে। আমি মনে মনে বলি, শালা, তোর বাপের পা! কিন্তু তা প্রকাশ না করে মুখে মিষ্টি একটা হাসি টেনে বলি, 'ভাইজান, আপনার পায়ের নিচে নরম নরম লাগে?'

ঝট করে লোকটি পা টেনে নেয়।

সুপারি চিবানো ভঙ্গিতে আমি বলি, 'আপনার আরামকে হারাম করার জন্য দুঃখিত।'

লোকটা মাথা নিচু করে ফেলে।

সামনের সিটে বসে ঝিমাচ্ছে এক লোক। তার হাঁ করা মুখে রাজ্যের ধুলো ঢুকছে। সে পরম যত্নে মুখ বন্ধ করে মাঝে মাঝে সে ধুলো গিলছে। আর তার

পাশের জন আপনমনে খোঁচাচ্ছে নাকের ভেতর। কী যেন বের করছে আঙুল দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মনে হচ্ছে কোনো গুপ্তধনের সন্ধানে আপ্রাণ চেষ্টা চলছে।

ডান পাশের লোকটা একটু সরে আসে। মোটা মানুষ। ভারসাম্য রাখতে কষ্ট হচ্ছে। বাসের ঝাঁকুনিতে তার ভুঁড়িটা যে টলবল করে নড়ছে, টের পাচ্ছি।

সিগন্যালে এসে বাসটা থামে। এই সুযোগে বাসের ভেতরটা ভালোভাবে দেখে নিলাম। বেশ কয়েকটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনের দিকে। সাদা ড্রেস। স্কুল কিংবা কলেজছাত্রী। বাসের ভেতরে পেছনের দিকে ভিড় একটু কম হলেও সামনের দিকটায় বেশ ভিড়। কারণ ঐ একটাই।

কথাটা আবার মনে হলো। ঘড়ির দিকে তাকাই। যাশশালা, অনেক বেজে গেছে। নিশ্চয় আজিজ, বিনয়, পিপলু আমার চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে ছাড়ছে। কিংবা ওরা এতক্ষণে শুরুই করে দিয়েছে। বুকের ভেতর কী যেন ধক করে উঠল। পেটের ভেতরও সামান্য গুড়গুড় শব্দ হলো। সে এক অব্যক্ত আনন্দ। অনেক দিন পর নাকি একটা ভালো মাল পাওয়া গেছে। আজিজের ভাষায়, অ্যান আন্‌নন্‌ ম্যাটার।

বাসটা চলতে শুরু করেছে। মোটা লোকটা এবার চেপে এসেছে। বিরক্ত লাগছে বেশ। কনুই দিয়ে তার ভুঁড়িতে একটু চাপ দিলাম। না, লোকটা সরে গেল না। মনে হলো আরো একটু এগিয়ে এসেছে। ভুঁড়িতে চাপ দিলে কি আনন্দ লাগে? আরো একটু জোরে চাপ দেই। না, লোকটা চেপেই আসছে। একটু চিন্তা করলাম। তারপর খেয়াল করে বেখেয়ালের ভান করে সুড়সুড়ি দিই ভুঁড়িতে। লোকটা দুটো গোত্তা মেরে সরে গেল। যাক্‌, মোক্ষম একটা অস্ত্র পাওয়া গেল।

বাম পাশের লোকটার দিকে তাকাই। রড ধরেই ঝিমাচ্ছে। রাতের পাবলিক নাকি। ঝিমাতে ঝিমাতে মাঝে মাঝে গড়িয়ে আসছে আমার দিকে। আমি হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দেই। কিছুক্ষণ পর আবার গড়িয়ে আসে। বিরক্তির শেষ সীমানায় গিয়ে লোকটার হাত ধরে বেশ জোরে ঝাঁকুনি দেই। হকচকিত চোখে সে আমার দিকে তাকায়। আমি হাসি মুখে বলি, 'ভাইজানের বোধ হয় ঘুম পেয়েছে।'

'সরি।' বিনয়ের একটা ভাব এনে বলে, 'রাতে ভালো ঘুম হয়নি।'

'রাতে বোধ হয় ব্যস্ত ছিলেন।'

লোকটা কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলে, 'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

'রাতে তো অনেক শ্রেণীর লোক ব্যস্ত থাকে। তো আমি ভাবলাম, আপনি কবিতা-টবিতা লেখেন কি না। রাত জেগে কবিতা না লিখলে নাকি সে কবিতা কবিতাই হয় না।'

'না, না।' লোকটা হেসে হেসে বলে, 'না, কবিতা-টবিতা আমি লিখতে পারি না।'

'তবে জানেন, ভাইজান, আমাদের গ্রামে ইদ্রিস নামে এক চোর ছিল। রাতের চোর। দিনের বেলা যখন হেঁটে হেঁটে সে পথ চলত, তখন ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই পথ চলত। অনেক দিন পর তার কথা মনে হলো।'

কথা বলেই আড়চোখে লোকটার দিকে তাকাই। রাগে চোখ দুটো কুঁচকে ফেলেছে। মনে মনে তৃপ্তি বোধ করি। দ্যাখ ব্যাটা, পায়ে পা রাখার ফল। গাধা কাঁহাকার।

বাসটা আবার থেমে যায়। সামনে বিরাট জ্যাম। গাড়ি নড়াচড়ার কোনো ভাব দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ পেছনের পকেটে হাত দিই। না, মানিব্যাগ আছে। মেজাজটা আবারও খিঁচড়ে উঠছে। নিশ্চয় আজিজ এতক্ষণে কিছু একটা করে বসেছে। শালা। মুখ দিয়ে হঠাৎ শব্দটা বের হলো। কার উদ্দেশে সেটা বোঝা গেল না। বেশি টাকা দিয়েছি আমি। কাজটা আমিই প্রথমে করব। তারপর অন্যরা। যদি... না আর ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

প্রায় নয় মিনিট পর বাস হেলেদুলে চলতে শুরু করে। ভ্যাপসা গরমে অবস্থা কাহিল। মোটা লোকটা বারবার রুমাল দিয়ে তার ঘাড় মুছছে আর কোত্ কোঁত্ শব্দ করছে। মিটিমিটি হেসে বললাম, 'খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

দন্তবিকশিত হাসিতে লোকটা বলে, 'মোটা মানুষ।'

'জি। তিনজনের বোঝা একজন টানলে যা হয় আর কি।'

লোকটা প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে বলে, 'জি?'

'মানে, আল্লা আপনার গায়ে-গতরে যে মাংস আর চর্বি দিয়েছে, মাশাল্লা তিনজন মানুষের তো হবেই।'

মুখ ঘুরিয়ে নেয় লোকটা। আমি মুখে মধু এনে বিনয়ের সঙ্গে বলি, 'ভাইজান কি রাগ করলেন? আসলে জানেন ভাইজান, কেউ পায়, কেউ পায় না তো, তাই কষ্ট হয়।'

ফিরে তাকায় লোকটি। আমি মৃদু হেসে দার্শনিক চেহারা বানিয়ে সামনে তাকাই।

কিছুক্ষণ পর টের পাই, পাশের দুজনই আমাকে আড়চোখে দেখছে। ভাবখানা, গোপন কিছু দেখছে। আমি হাসিভরা মুখে দাঁড়িয়ে থাকি। হাসিমুখ সবাই পছন্দ করে। গোমরা মুখ কেউ দেখতে চায় না।

বেশ জোরেই চলছিল বাসটা। হঠাৎ কেন যেন তা ব্রেক কষে। সঙ্গে সঙ্গে মোটা লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমার ওপর। বাম পাশের লোকটা সামনের জনের ওপর। আর সিটে বসা ঝিমানো লোকটা সামনের সিটে কপাল ঠুকে বিকৃত মুখে মাথায় হাত ডলছে। এরই মাঝে কোনো একটা মেয়ে বেশ জোরে বলে ওঠে, 'অসভ্য।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ। তারপর একটা পুরুষ কণ্ঠ, 'মুখ সামলে কথা বলবেন।'

'মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে বেশ মজা লাগে, না?'

'আমি কি ইচ্ছে করে দিয়েছি নাকি!'

'সবাই তা-ই বলে। আপনি সেই কখন থেকে আমার গা সেঁটে দাঁড়িয়ে আছেন। লম্পট কোথাকার!'

'আপনি মাত্রা ছেড়ে যাচ্ছেন।'

'মারবেন নাকি আপনি?'

কৌশলে বাঁয়ের লোকটাকে পাশ কেটে সামনে যায়। পুরুষ কণ্ঠের পাশে গিয়ে বলি, 'কী হচ্ছে?'

পুরুষ কণ্ঠ আমাকে একটু জরিপ করে। তারপর বলে, 'দেখুন না, এই মেয়েটা আমাকে যা-তা বলছে।'

আমি মেয়েটার দিকে তাকাই। মুখে হাসির রেখা টেনে বলে, 'ম্যাডাম, ব্যাপার কী?'

'এই লোকটা আমার...।' মেয়েটা থেমে যায়।

আমি আবার পুরুষ কণ্ঠের দিকে তাকাই। খুব মৃদু স্বরে তাকে বলি, 'মা-বোনদের সম্মান করতে শিখুন।'

'আপনি ভুল...।'

হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে থামিয়ে দিই, 'রাস্তাঘাটে মেয়ে দেখলেই গায়ে হাত দিতে ইচ্ছে করে অনেকের।'

'আপনি এসব কী বলছেন?'

'আহ থামুন। এই আপনাদের মতো কিছু পুরুষমানুষের জন্য সমস্ত পুরুষ জাতির নিন্দা হয়। তারা রাস্তাঘাটে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে, শিস বাজায়, জোর করে সব কিছু করার চেষ্টা করে। ছিঃ, বড় লজ্জা লাগে। তাদের জন্যই দেশে এত প্রসটিটিউটের সংখ্যা বেড়ে গেছে। পরবর্তীকালে পয়সার বিনিময়ে প্রতিনিয়ত হাতবদল হয় তারা। তা ম্যাডাম, আপনি কোথায় নামবেন?' মেয়েটির দিকে তাকাই।

'সামনের স্টপেজে।'

'আমিও নামব।'

বাস থামার সাথে সাথে লোকটার দিকে তাকাই। মুখটা শুকিয়ে গেছে। একটু কষ্ট হলো। কিন্তু পাত্তা দিলাম না। মানুষের সব কষ্ট দেখলে উদ্দেশ্য হাসিল করা যায় না।

মেয়েটা নেমেই বলল, 'ধন্যবাদ।'

'আসলে দেখুন সব মানুষ কিন্তু এক না। কিছু কিছু লোকের জন্য সব মানুষের দোষ হয়।'

'ঠিক বলেছেন। তবে এত খারাপ মানুষের মাঝে আপনাদের মতো ভালো মানুষের খোঁজ পাওয়া খুব কঠিন।'

লজ্জা মিশ্রিত হাসিতে বলি, 'ঠিক আছে, আবার দেখা হবে। আপনাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে খুব।'

'জি বলুন।' মেয়েটা কৌতূহলী চোখে তাকায়।

বললাম, 'আজ না। একই পথের যখন যাত্রী, আবার দেখা হবে। তখনই না হয় বলব।'

'না-না, আজই বলুন না।'

'না থাক।' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে বলি, 'এখানে রিং করলে আমাকে পাবেন। রিং করবেন। আমরা গল্পও করব, সেই কথাটাও বলব।'

মেয়েটা তবুও কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকে। আমি অন্যদিকে তাকাই। 'সব কৌতূহল মেটা কি উচিত? জীবনে রহস্য না থাকলে আনন্দ কোথায়।' আমি চেহারায় গম্ভীর ভাব এনে হাঁটতে থাকি।

বিদায় নিয়ে মেয়েটা অন্য রাস্তায় চলে গেল। ঘড়ির দিকে তাকাই। আল্লারে, আজ বোধ হয় কপালে কিছু নেই। খুব দ্রুত একটা স্কুটার ডেকে উঠে পড়ি।

দরজা খুলেই পিপলু আমার ওপর রেগে গেল। আমি সেদিকে খেয়াল না করে ইশারায় বুঝালাম, কই?

'পাশের ঘরে।'

'একা?'

'না, আজিজ আছে।'

'ও আগে গেল কেন?'

'শালা, তুই এত দেরি করলি যে।'

'কী করব বল। বাসের ভেতর একটা মেয়ের সাথে পরিচয়, আলাপ এবং গল্প। তোর টেলিফোন নম্বরটা কিন্তু তাকে দিয়েছি আমি। রিং করলে জমিয়ে ফেলিস। তারপর তো বুঝতেই পারছিস। তা আজকের মালের বয়স কত রে?'

'একেবারে কচি। সুইট সিক্সটিন।'

'প্লিজ, আজিজকে তাড়াতাড়ি করতে বল। এরপরেই আমি। ওদিকে মিলি আবার অপেক্ষা করবে বিজয় সরণির মাথায়। ওকে নিয়ে আজ বেড়াতে যাব সাভারে। সেলিমদের খামার বাড়িতে সেলিম একা থাকবে।'

বলতে বলতেই চুপচুপে ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে আজিজ পাশের ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে এলো। আমি ওর দিকে তাকিয়ে বাঁ চোখটা টিপলাম। তারপর ওই ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিই।

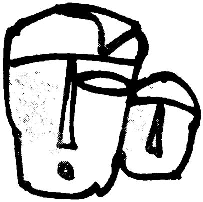

সাপ

তারপর।

তারপরও সে চেয়ে থাকে লোকটির দিকে। চেনা-চেনা ভাব থেকে এখন সম্পূর্ণ চেনা। আধো-আধো পরিচিতির পাশ কাটিয়ে এখন পূর্ণ পরিচিত। সেই দৃষ্টি, সেই মুখ। বলিষ্ঠ শরীরে চামড়াগুলো একটু কুঁচকে গেলেও এখনো চকচকে। ছোট্ট ছাগুলে দাড়িতে পাক ধরলেও এখনো বেশ কালো। তামার খিলালটা সেই আগের মতো গলায় ঝুলানো। শুধু সাধারণ টুপির স্থলে এখন সোনালি জরির টুপি এবং নতুন চরের মতো জেগে ওঠা কপালের মাঝখানের কালো দাগটা জানিয়ে দেয়, ইদানীং তিনি নামাজ পড়েন।

ব্যথার একটা বোধ এসে সমস্ত শরীরে জড়িয়ে যায় ছেলেটির।

সেই সন্ধ্যা।

টিপটিপ বৃষ্টি। অন্ধকার। মাঝে মাঝে গুলির শব্দ।

ছেলেটি। একা। মা-বাবা-ভাই-বোন চলে গেছে। কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি। গ্রামের বাড়ি।

সে রয়ে গেছে। পাহারাদার হিসেবে। বাড়ির। সম্পত্তির।

ভীষণ আপত্তি ছিল। মা। বাবার। তার নিজেরও।

শুধু দায়িত্ববোধ। আর আর..., না থাক। ধূসর। সে আজ বিবর্ণ।

একটু একটু শীত। একটু ঠাণ্ডা বাতাস।

হঠাৎ একটা চিৎকার। মেয়েলি। মেয়েমানুষের।

চমকে ওঠে সে।

কয়েক জোড়া বুটের শব্দ। খট-খট। দরজা ভাঙার শব্দ। ঠাসঠাস।

খ্যাস্। কে যেন ম্যাচ জ্বালাল। আলো হলো পাশের ঘরটা। একটি মেয়েমানুষ, তিন জোড়া বুটওয়ালা পা আর অন্য একজন।

রহমত চাচা।

ব্যস্ত। জাতির এই দুর্যোগময় মুহূর্তে বড্ড ব্যস্ত!

মুখে মৃদু হাসি। গলায় ঝুলানো তামার খিলাল। চিকচিক করছে। ছোট্ট দাড়িগুলো নেচে উঠছে। মাঝে মাঝে। অল্প আলোয় অল্প নাচন।

কিছুক্ষণ। ফিসফাস। খসখস। টুংটাং। চুড়ি। কাতরানি।

কিছুক্ষণ। বেশ কিছুক্ষণ।

তারপর।

একটা শব্দ। গুলির। মৃত্যুর।

সব দেখল। ছেলেটি।

পাশের ঘরের বাঁশের বেড়ার ফাঁক থেকে চোখটা সরিয়ে নিতেই অন্য বেড়ায় টাঙানো কাচ দিয়ে বাঁধানো 'আয়াতুল কুরসি'। সে দেখল। স্রষ্টার সৃষ্টি। স্রষ্টার বাণী।

রাত কাটল। কাটল দিন। ইচ্ছে ছিল চলে যাওয়ার। কিন্তু হলো না। দিনেও বিপদ। জানোয়ার। বুটওয়ালা বিদেশী। বুট ছাড়া দেশী।

অবাধ বিচরণ। স্বাধীন পদচারণ।

আবার সন্ধ্যা।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। শব্দ হচ্ছে।

মেঘ। খট খট। ঝিঁঝি।

হঠাৎ খট-খট। একটু জোরে। একটু দূরে।

লাফিয়ে ওঠে সে। থমকে দাঁড়ায়। বেড়ার কাছে। বেড়া ঘেঁষে। তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে থাকে।

রহমত চাচা!

আরো পাঁচ-ছয়জন। চেনা, না অচেনা। বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়। আলো হয়। মুখ দেখা যায়, চেনা যায় না। বাবার ঘরটা খোলা। যতসব জিনিসপত্র। লোকগুলো বের করছে, জিনিসপত্র বের হচ্ছে। রহমত চাচা দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁত খোঁচাচ্ছেন। খিলাল দিয়ে। তামার খিলাল।

ব্যর্থতা। ছেলেটি ভাবে।

তার। পাহারাদারের।

ভীতু। ভয়। নিজের। প্রাণের। অস্তিত্বের।

আবার ভাবে।

পরাজিত। নিজের কাছে। সত্তার কাছে।

স্বার্থপরতা। নিজেকে বাঁচানো। নিজেকে রক্ষার।

সমস্ত বুক খালি করা একটা দীর্ঘশ্বাস।

কোথায় যেন একটা কুকুর ডেকে ওঠে। কান্নার মতো। হয়তো কাঁদছে। কাউকে হারিয়েছে। অথবা নিঃসঙ্গতা।

কুকুর—সে। জানোয়ার—মানুষ। সময়ে সবাই এক।

পরিচিত মুখ। হঠাৎ। ভেসে ওঠে। এক এক করে। একে একে।

প্রিয় মুখ। বাবা। মা। ভাই। বোন।

বৃষ্টি আবার শুরু।

অল্প অল্প শীত।

জমাট অন্ধকার।

একটানা ঝিঁঝি শব্দ। অনেকক্ষণ।

চোখ বুজে আসে ছেলেটার। ঘুমিয়ে পড়ে। খেয়ালবশত।

হয়তো প্রকৃতিগত।

ভীষণ এক চিৎকার। হঠাৎ।

লাফিয়ে ওঠে সে।

বুঝতে পারে না কিছুই। জমাট বেঁধে আছে মাথাটা। কী হচ্ছে? কোথায় হচ্ছে? সারা শরীরে ঘাম। স্বপ্ন দেখছিল কি?

কানের মধ্যে একটানা শাঁ শাঁ।

মধ্যরাত।

আর একটু শব্দ হতেই সজাগ হলো সে। পেটটা চোঁ চোঁ করছে। টিনে মুড়ি আছে। গুড় আছে। খাওয়া হয়নি। খাওয়া হয়নি। চিঁউ করে একটা শব্দ হলো। পেট থেকে। পেটের ভেতর থেকে। চমকে উঠল ভীষণ। কেউ শুনে ফেলতে পারে। ফেলল কি?

চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে উঠোনটা।

রহমত চাচা।

আরো কয়েকজন। আর দুটো লোক। হাতবাঁধা।

তাকিয়ে আছেন রহমত চাচা। কটমটিয়ে। রাগী চোখ। আগুনদৃষ্টি।

এগিয়ে গেলেন তিনি। দাঁত খোঁচাচ্ছেন। খিলাল দিয়ে। তামার খিলাল।

কিছু বলছেন। শোনা যায় না। শোনা যাচ্ছে না।

কুকুরের লালার মতো লালা। খিলালটায়। চিকচিক করছে। চাঁদের আলোয়। তাকিয়ে আছে লোক দুটোও। নিষ্পাপ দৃষ্টি। সেখানে ভয় আছে। কর্তব্য। স্বাধীনতা। নির্ভীকতা। সাহিসকতা। স্নিগ্ধতা।

পাশে হাত বাড়ান চাচা।

একটা দা এগিয়ে আসে। চকচকে। বাঁকা।

কিছু বোঝার আগেই দুটো কোপ। দুজনের ঘাড়ে।

কেঁপে ওঠে সে।

মাথা দুটো ঝুলে পড়ে। মাটিতে পড়ে যায়। দুজন মানুষ। দুটো দেহ। খিঁচুনি। গলগল রক্ত। মরে যাচ্ছে। শান্ত হয়ে যাচ্ছে। স্থির হয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যু। ওটা ওদের নয়। মানবতার। মনুষ্যত্বের। স্বাধীনতার। মুক্তির।

ওরা এগিয়ে আসছে। এ ঘরের দিকে। বুকটা ধুকপুক করছে। শরীরটা জমে যাচ্ছে। ওরা নয়, মৃত্যু আসছে। কিন্তু এলো না। ফিরে যায়। চলে যায়।

বেঁচে যায় সে।

সৃষ্টিকর্তার দয়া না কাকতালীয়? সে বুঝতে পারে না। বোঝে না। সবাই চলে গেছে। পুবের আকাশ ফর্সা হচ্ছে। বেরিয়ে আসে সে। এগিয়ে যায় লাশ দুটোর দিকে।

শান্ত। স্থির। আধখোলা চোখ। পৃথিবীর রূপ দেখছে। হয়তো প্রকৃতির নির্মমতা।

শিশির পড়ছে। মুখ দুটো ভেজা-ভেজা। চোখের কোনা দিয়ে কী যেন গড়িয়ে পড়ছে।

কাঁদছে? হয়তো। মানবতার পতন দেখে। মনুষ্যত্বের স্খলন দেখে।

লাশ দুটোর ওপর একটু ঝুঁকে আসে সে। চিনতে পেরেছে।

পাশের গ্রামের। মুক্তিযোদ্ধা।

চোখ দুটো জ্বলছে। ব্যর্থতায়। অকর্মণ্যতায়।

বসে পড়ে সে। চোখগুলো বুজিয়ে দেয়। ঘুমিয়ে আছে। শান্ত। মায়াময়। শান্তি। সারা মুখে। দেশের জন্য। মানুষের জন্য। কিছু করার জন্য।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

স্থবিরের মতো আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে। শূন্য দৃষ্টি।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে সে। বাড়ি থেকে। আবাস থেকে। গন্তব্যহীন।

এক মাস। দু মাস। কয়েক মাস পর।

পরিবর্তন। দেশের। সময়ের। অবস্থানের।

ফিরে আসে সে।

একা। সে বেঁচে আছে। বাবা নেই। মা নেই। বোন নেই। ভাই নেই। বুট ছাড়া দেশী জানোয়ারের শিকার। সে শুনেছে । দেখেনি।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় নিজেদের বাড়ির সামনে। সাইনবোর্ড ঝুলছে একটা—ক্রয়সূত্রে এ সম্পত্তির মালিক এখন অন্যজন। সে তাকিয়ে দেখে। অবিশ্বাস্য!

দরজায় টোকা দেয়।

কিছুক্ষণ।

বেরিয়ে আসে একটা লোক।

ভীষণ চমকে ওঠে সে।

তারপর।

তারপরও সে চেয়ে থাকে লোকটির দিকে। একদৃষ্টিতে।

ছোট্ট ছাগুলে দাড়ি। তামার খিলাল।

মৃত্যুসংকেত

খুনটা করার পর ওরা ঘোড়া থেকে নামে। তারপর শান্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে পা রাখে লাশটার গায়ে। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লাশটির পিঠে মাত্র একটি গুলির দাগ। অথচ তিন পাশ থেকে তিনটা গুলি করা হয়েছে। পাটা আস্তে আস্তে সরিয়ে এনে গুলির গর্তে বুট দিয়ে এমন জোরে চাপ দেয়, একদলা রক্ত চিড়িক করে বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দিল বুটটা। সূক্ষ্ম এক ক্রূর হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে। ডান হাতের .৪৪ পিস্তলটা কোমরে গুঁজে সে গর্বিত চোখে তাকায় তার সঙ্গী দুজনের দিকে। গর্বের হাসিতে ভরে যায় ওদের মুখও।

পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে এল জ্যাকো। তাতে আগুন লাগাতে লাগাতে সামনে জঙ্গলের দিকে চোখ পড়তেই ভীষণ চমকে ওঠে সে। এক মুহূর্ত আগে সেখানে কে যেন ছিল, কিন্তু তার চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাই হয়ে গেল লোকটা। সরে গেল এবং এতো দ্রুত সরে গেল যে, কিছু টেরই পাওয়া গেল না। চেনা গেল না কী ছিল সেটা। ক্ষিপ্রগতিতে এবং যথাসম্ভব নিঃশব্দে দৌড়ে গ্রিজউডের ঝোপের একদম কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে। পিস্তলের বাঁটটা চেপে ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় সেই জায়গাটায়, যেখানে কিছুক্ষণ আগে সে কাউকে দেখেছে। কিন্তু হতাশ হলো জ্যাক। সত্যি সেখানে কেউ নেই। ঘাসগুলোও কেমন খাড়া হয়ে আছে, যেন কোনোকালোই এখানে কারো পা পড়েনি। নিচু হয়ে ঘাসগুলোতে হাত রেখে দেখল, না একটা ঘাসও ভাঁজ হয়ে নেই। তবে কি সে ভুল দেখল? আপনমনেই মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কী যেন ভাবে জ্যাক। অসম্ভব! তার চৌত্রিশ বছরের চোখ ভুল দেখতে পারে না। অবশ্যই এখানে কেউ ছিল। কিন্তু কে? তবে কি—। পিস্তলের বাঁট থেকে হাতটা সরিয়ে এনে সে তার মাথার পেছনে রাখে। দৃষ্টিটা যথাসম্ভব দূরে মেলে দেয়। ঘন হয়ে যাওয়া ঝোপের কারণে বেশি দূরে সে দৃষ্টি যায় না। হতাশার ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে দোলাতে ফিরে আসে সে আগের জায়গায়।

'কোনো প্রবলেম, বস?' দুজন সঙ্গীর একজন এগিয়ে আসে।

'পেছনে টিকটিকি লেগেছে, ব্লান্ডি!'

'কোথায়?' চোখ দুটো বড় বড় করে ফেলে ব্লান্ডি।

‘সামনে ঝোপে ছিল।’

‘আপনি দেখেছেন?’ ব্লান্ডিকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে জ্যাকের কাছাকাছি আসে ব্রাউন।

‘হ্যাঁ, তবে তার দিকে চোখ পড়ামাত্র সে সরে গেছে।’

‘ওখানে গিয়ে কিছু বুঝলেন?’

‘না।’

মুখটা হাসি হাসি করে ব্লান্ডি বেশ শান্ত ভঙ্গিতেই বলে, ‘আপনি তাহলে ভুল দেখেছেন, বস।’

ফোঁস করে ওঠে জ্যাক। আগুনরাঙা চোখে ব্লান্ডির দিকে তাকিয়ে বলে, ‘আমি কখনো ভুল দেখি না, ব্লান্ডি। অবশ্যই কেউ ছিল সেখানে।’

‘কে?’ অস্ফুট স্বরে ব্রাউন প্রশ্নটা করে মুখ বন্ধ করে ফেলে। বেশ জোরেশোরে একটা ঢোক গিলে জ্যাকের দিকে তাকায়। চোখ দুটো এরই মধ্যে লাল হয়ে গেছে তার।

‘প্রশ্নটা আমারও।’

‘আমাদের কয়েক দিন একটু সাবধানে থাকতে হবে।’ ব্লান্ডি সাপোর্ট পাওয়ার আশায় জ্যাকের দিকে তাকায়।

‘কেন?’ খ্যাঁক খ্যাঁক করে চিৎকার করে ওঠে জ্যাক।

‘না বলছিলাম...।’

‘না, কোনো বলাবলি নেই, চোখের সামনে সন্দেহের যেই পড়বে তাকেই গুলি।’

‘যদি আমাদের এ ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায়?’

‘যাক, কিছু আসে যায় না।’

‘কিন্তু এভাবে আর কত দিন?’

‘তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, ব্রাউন। তোমার বোধ হয় ছুটি দরকার।’

মাথা নিচু করে ফেলে ব্রাউন। জ্যাক একটু এগিয়ে এসে ব্রাউনের কাঁধে হাত রেখে বলে, ‘ঠিক তত দিন ব্রাউন, যত দিন আমার ভাই আমার মন থেকে মুছে না যাবে।’

‘একদিন তো এসব আর গোপন থাকবে না, বস।’

‘সেদিনটা অনেক দেরি।’

‘তার মানে কি আমরা একটার পর একটা খুন করেই যাব।’ ব্লান্ডি একটু এগিয়ে আসে।

আড়চোখে ব্লান্ডির দিকে তাকিয়ে জ্যাক বলে, ‘ইয়েস।’

‘নিও নিয়ম অনুযায়ী এভাবে খুন করা তো অন্যায়?’

‘তবুও, যত দিন না আমি সব কিছু ভুলে যাই।’

‘কিন্তু যাকে আমরা খুন করব, অন্তত একবার তাকে ড্র করার সুযোগ দেওয়া

উচিত।'

'উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন পরে, ব্রাউন। একেকটা শেরিফকে কাদাখেকো শূকরের মতো মনে হয়, আমার হাত তখন নিশপিশ করতে থাকে। গুলি না করা পর্যন্ত আমার শান্তি আসে না।'

'কিন্তু পেছন থেকে গুলি করা কিংবা তিন পাশ থেকে তিনজন আক্রমণ করা, কেমন যেন নিজের কাছেই ছোট লাগে, বস।'

'ব্রাউন, তুমি আমার কষ্ট বুঝতে পারছ না। যেদিন আমার ভাইকে গুলি করে মেনজেনিটারের ডালে ঝুলিয়েছিল শেরিফ, সেদিন থেকেই আমি পণ করেছি, এ এলাকায় কোনো শেরিফককে আমি দুদিন বাঁচতে দেব না। তাকে আমি গুলি করে মারব এবং আমার ভাইকে যেমন ঝুলিয়েছিল, আমিও তেমনি ঝুলাব। ওকে?'

পকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করে জ্যাক ঠোঁটে রাখল। আগুন ধরাতে গিয়ে কাঠিটা ফেলে দেয় দূরে। কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে খুব শান্ত স্বরে বলে, 'এ পর্যন্ত কতজন হলো, ব্লান্ডি?'

বুলেটের কয়েকটা খোসা জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে গুনতে লাগল ব্লান্ডি। শেষে চোখমুখে একটা তৃপ্তির আভাস এনে একটু শব্দ করেই বলে, 'সাত।'

'তোমার কী মনে হয় আর কেউ আসবে এখানে?'

'মনে হয় না।' ব্লান্ডি জবাব শেষ করার আগেই ব্রাউন তার হলুদ দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে, 'যদি আসেই, তবে সংখ্যা আরেকটা বাড়বে—আট।'

কথাটা শুনে জ্যাক হাসে। গভীর মনোযোগ দিয়ে সিগারেটে আগুন ধরিয়ে এক রাশ ধোঁয়া ছাড়ে আকাশে। ধোঁয়ার কয়েকটা রিং মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ব্রাউন চিৎকার করে ওঠে। ঝট করে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে জ্যাক চমকানো কণ্ঠে বলে, 'কী হয়েছে?'

'কে যেন ওই ঝোপের আড়ালে।'

'কোথায়?'

গ্রিজউডের পাশে মেনজেনিটার ঝোপটা দেখিয়ে ভয়ার্ত চোখে ব্রাউন বলে, 'ওখানে।'

সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটা হাতে নিয়ে দৌড়ে গেল জ্যাক। পেছনে ব্লান্ডি ও ব্রাউনও। কিন্তু মেনজেনিটারের ঝোপের কাছে এসে সবার চেহারায় হতাশা ছড়ায়। কেউ নেই সেখানে, ঘাসগুলো দেখে মনে হচ্ছে কেউ ছিলও না।

শেরিফের লাশটা মেনজেনিটারের ডালে ঝুলিয়ে ওরা ঘোড়ায় চড়ল। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর শহরে প্রবেশ করে ওরা। সেলুনের ঠিক কাছাকাছি এসেই

ঘোড়ার গতি কমিয়ে দেয় জ্যাক। সেলুনের পাশেই ফাঁকা জায়গাটায় একটা ভিক্ষুক বসে আছে। চোখ দুটোর পাশ বিশ্রী রকমের কালো, দেখেই বোঝা যাচ্ছে অন্ধ।

দুই

সেলুনে ঢুকে সোজা কোনার টেবিলটাতে গিয়ে বসে জ্যাক। সারা সেলুন থমথমে। কেউ কোনো কথা বলছে না। ব্লান্ডি আর ব্রাউন দুটো বোতল এনে টেবিলের ওপর রাখে। তারপর দুটো চেয়ার টেনে বসে পড়ে জ্যাকের দুপাশে।

'সবাই কেমন যেন চুপচাপ, ব্লান্ডি।'

'হ্যাঁ, তবে বুঝতে পারছি না কেন।'

'মাত্র তো ঘণ্টাদুয়েক শহরের বাইরে ছিলাম, এরই মধ্যে আবার কী হলো?'

'নিশ্চয়ই কোথাও কোনো কিছু হয়েছে।' গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে ব্রাউন সামনের দিকে তাকায়।

'একটু খবর নিতে পারবে, ব্রাউন?' জ্যাক তার গ্লাসটা ঠোঁটে ঠেকায়।

ব্রাউন উঠে দাঁড়াতেই জ্যাক তাকে থামিয়ে দিল হাত দিয়ে। তারপর একটা আঙুল ঠোঁটে ঠেকিয়ে তাকে চুপ থাকতে বলল। আগের জায়গায় ব্রাউন বসে পড়তেই ব্লান্ডি ও ব্রাউন দুজনকে ইশারা করল পাশের টেবিলের দিকে নজর দিতে। টেবিলের বাঁ পাশের জন বলছে, 'শেরিফ খুন হয়েছে।'

'কী।' ভীষণ চমকে উঠে ডান পাশের জন বড় বড় চোখ করে তাকাল বাম পাশের জনের দিকে। চোখে·ইশারা করে তাকে উত্তেজিত হতে মানা করল বাম জন। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'খুন যে হয়েই যাচ্ছে, এ পর্যন্ত তো যেন কতজন হলো, রাদাল?'

'মনে নেই।' রাদাল মাথাটা এদিক-ওদিক করতে করতে বলল, 'এভাবে যদি শেরিফরা খুন হতেই থাকে, তবে তো এদিকে কোনো শেরিফ আসতেই চাইবে না।'

'তাতে এলাকাটা নরকে পরিণত হবে।'

'তোমার কী মনে হয় মাশল, এসবের পেছনে বড় কোনো দল রয়েছে?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না।' মাশলের চেহারা হতাশায় ভরে গেল।

জ্যাক উঠে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্লান্ডি ও ব্রাউনও। বাইরে এসে জ্যাক আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে, 'ব্লান্ডি, তুমি তো এখন চলে যাবে?'

'হ্যাঁ, তবে আজ গরুর মাংস কিনতে হবে, একটু দেরি হতে পারে।'

'ঠিক আছে তুমি যাও। ব্রাউন, তুমি?'

'আমিও যাব, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

'ওকে, তোমরা যাও, আমি আসছি।'

সিগারেটটা নিভে গেছে জ্যাকের। পকেট থেকে লাইটার বের করে সিগারেটটা ধরিয়ে যেই সামনে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে সে। একদম নিঃশব্দে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেই অন্ধ ভিক্ষুকটা, মাথার হ্যাটটা তার সামনে মেলে ধরা। ভিক্ষা চায়।

তিন

মাথার ভেতর এক ধরনের দুশ্চিন্তা খেলা করছে। কোনো স্বস্তি আসছে না মনে। কেমন যেন সব ওলট-পালট লাগছে। এবার সবকিছু ঝেড়ে ফেলে বাথানের কাজে মনোযোগী হওয়া দরকার। আপনমনে এসব ভাবতে ভাবতে জ্যাক যখন বাড়ি ফিরছিল, ঠিক তখনই তার পাশের ঝোপের আড়ালে কিসের শব্দ হলো।

শিরদাঁড়া সোজা হয়ে যায় জ্যাকের। ঘোড়ার লাগাম টেনে একটু থামে। ভালোভাবে দেখে নেয় আশপাশটা। না, কেউ নেই, এমনকি কোনো পোকামাকড়ও।

আশপাশে ইদানীং রাসলারদের উৎপাত বেড়েছে। যেভাবেই পারছে তারা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে গরু। মাঝে মাঝে অনেক গরু মেরেও ফেলছে। কোনোভাবেই তাদের ঠেকানো যাচ্ছে না। যদিও এদিকটায় তেমন গরু চুরি হয় না, তবে কি চুরি হওয়া শুরু হবে? এ মুহূর্তে কোনো কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না জ্যাকের।

ঝিমঝিম শুরু হয়েছে মাথার ভেতর। চারদিকে হয়তো কোনো কিছু ঘটছে, কিন্তু সে টের পাচ্ছে না। কী ঘটছে, কোনো কিছুই ঠাঁই পাচ্ছে না মাথায়। এক ধরনের জট পেকে যাচ্ছে।

ভীষণ গরম লাগছে এখন। সূর্যটা মাথার উপরে তেতে উঠেছে। একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার। ট্রেইল ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াটা। উদাস হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে জ্যাক। একা একা লাগছে। ব্লান্ডি আর ব্রাউন চলে গেল, ওদের একজন এ মুহূর্তে থাকলে ভালো লাগত। মুখটা তেতো হয়ে গেছে। তবু পকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে চাপায় জ্যাক। অনেকক্ষণ সেটা সেভাবেই থাকে। আগুন লাগাল না তাতে।

সামনে ঘন ঝোপ। প্রায় অন্ধকার-অন্ধকার লাগছে এখন এখানটা। সিগারেটটা ধরিয়েই ফেলে জ্যাক। আয়েশ করে একটা টান দিতেই টের পায়, গলাটা শুকিয়ে গেছে। পানি খাওয়া দরকার, কিন্তু আশপাশে কোনো পানি নেই।

কে যেন বলেছিল, সবসময় কাছে কিছু পানি রাখবে। অনেক দিন পর মনে পড়ল কথাটা। সিগারেটে জোর টান দিয়ে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে সে। বুক

থেকে গরম বাতাস যেন বের হয়ে গেল। ঘোড়াটা তার হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার কম এ জায়গাটায়। সামনে আরেকটা ঝোপ। ওটা পার হওয়ার পর আর একটু। তারপর রেস্ট, বিশ্রাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় জ্যাক, আগামী দুদিন আর বের হবে না, শুধু ঘুমাবে। হঠাৎ ঘোড়াটা থেমে যায়। তারপর চিৎকার করে ওঠে বিকট স্বরে। মাথাটা এতক্ষণ নিচু করে রেখেছিল জ্যাক। ঘোড়ার চিৎকারে মাথাটা তুলতেই সে একেবারে পাথরের মূর্তির মতো শক্ত হয়ে যায়। সামনে পাইন গাছের মোটা একটা ডালের সঙ্গে ঝুলে আছে ব্লান্ডি। বুকের কাছটা ভিজে গেছে রক্তে। কিছুক্ষণ পর পর এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে রক্ত চুইয়ে পড়ছে মাটিতে।

চক্কর দিয়ে ওঠে মাথাটা। দ্রুত পিস্তলটা হাতের মুঠোয় এনে সোজা এসে থামে লাশের সামনে। ব্লান্ডির দেহটা নেড়েচেড়ে দেখে। সামনে থেকে গুলি করা হয়েছে। পিস্তলটা পড়ে আছে মাটির ওপর। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ড্র করার সুযোগ পেয়েছিল ব্লান্ডি, কিন্তু হেরে গেছে প্রতিপক্ষের ক্ষীপ্রতার কাছে।

শিরদাঁড়া বরাবর ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে যায় জ্যাকের। শেরিফের লাশ যেভাবে ঝুলানো হয়, ব্লান্ডির লাশটাও সেভাবে ঝুলে আছে। কোনো পার্থক্য নেই, শুধু শেরিফের সবকিছু জানলেও ব্লান্ডির খুনি কে, তা সে জানে না। জানার কোনো সূত্রও নেই এ মুহূর্তে।

চার

খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল জ্যাকের। সাধারণত এত সকালে ঘুম ভাঙে না তার। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে সেই যে কাল বিকেলে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে, তার পরেই ঘুম এবং তা ভাঙল আজ সকালে।

কষ্ট হচ্ছে ব্লান্ডির জন্য। কে করল খুনটা? কার এত সাহস? জ্যাকের এলাকায় এসে জ্যাকের মানুষ খুন, বুকের পাটা বলতে হবে খুনির। কিন্তু কে সেই খুনি?

মাথায় এখনো পর্যন্ত কারো কথা মনে আসছে না। তিন বছর আগে একবার জন্টির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল ওদের। কিন্তু সেসব তো মিটমাট হয়ে গেছে। জন্টি পেশাদার খুনি হলেও এতদিনে তার এসব ভুলে যাওয়ার কথা।

দ্রুত তৈরি হয়ে নিল জ্যাক। ব্রাউনকে খবর দিতে হবে। ঘর থেকে বের হতে গিয়েই সে থেমে যায়। কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে, ঘরের বাইরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে কেউ গুলি করবে তাকে। কোমর থেকে পিস্তলটা নিয়ে খুব ভালোভাবে দেখে নেয়। মনে হচ্ছে সাবধানে থাকতে হবে এ কয়দিন। এই কষ্টের সময়ও একটু হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে। স্নায়ু তার কোনোকালেই দুর্বল ছিল না, এখনো নেই। তবু কেন জানি ভয় লাগছে তার।

নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করে সে। যথাসম্ভব নিজেকে প্রস্তুত করে তারপর বাইরে আসে। ঘোড়াটা বাঁধা রয়েছে একটু দূরে। আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে সে যখন জিনে পা রাখে, ঠিক তখনই কেমন যেন ঘাড়টা শিরশির করে ওঠে। ঠাণ্ডা একটা বাতাস বয়ে যায় ঘাড় ছুঁয়ে।

ঘোড়াটা একমনে এগিয়ে চলছে ট্রেইল ধরে। কোনো তাড়া নেই যেন। জ্যাকেরও যেন খেয়াল নেই। তার সারা মুখে চিন্তার ছায়া। ডান হাতটা সব সময় পিস্তলের বাঁট স্পর্শ করে আছে। ব্রাউনের ঠিক বাসার কাছে এসে ঘোড়া থামায় সে। মাথা নিচু করে কী যেন ভাবে; তারপর ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে এগিয়ে যায় তার ঘরের দিকে।

দরজার পাশে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা আছে ব্রাউনের ঘোড়াটা। শান্ত মনে ঘাস খাচ্ছে। জ্যাক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দুটো টোকা দেয়। ভেতর থেকে কোনো শব্দ নেই।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে দরজার সামনে। একটু ভাবে, তারপর আবার টোকা দেয় দরজায়। এবারও কোনো সাড়া নেই। ভেতরে কোনো শব্দও হচ্ছে না। আস্তে করে দরজায় চাপ দেয় জ্যাক। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। সামান্য অপেক্ষা করে সে। না, আসলেই কোনো শব্দ নেই। ঘরের ভেতরে পা রেখে ঝট করে একবার চারদিকে চোখ বোলায়। ঘরটা ফাঁকা, কেউ নেই। খুব দ্রুত বাইরে এসে ব্রাউনকে চিৎকার করে ডাকে জ্যাক। কোনো উত্তর নেই। শুধু ওর ঘোড়াটা একবার ঘাস খাওয়া বন্ধ রেখে মুখ উঁচু করে তাকাল।

আরো কয়েকবার ব্রাউনকে ডেকে জ্যাক সাড়া পেল না। আস্তে আস্তে সে হেঁটে যায় বাড়ির পেছন দিকে। বড় ওক গাছটার দিকে চোখ পড়তেই পেটের ভেতর প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে ওঠে। ওকের বড় একটা ডালের সঙ্গে ঝুলে আছে ব্রাউন, ব্লান্ডির মতোই। সারা শরীরে বড় বড় লাল পিঁপড়ে।

পাঁচ

অসম্ভব দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছোটাচ্ছে জ্যাক, যত দ্রুত সম্ভব শহরে যাওয়া দরকার। সারাক্ষণ মনে হচ্ছে পেছনে কে যেন আসছে। একটু পর পর ঝট করে সে পেছনে তাকায়, কিন্তু কাউকে দেখে না সে।

ঘন ঝোপের মধ্যে ট্রেইল ধরে যাওয়ার সময় শোঁ শোঁ করে আওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু কোনো দিকে খেয়াল নেই তার। একই চিন্তা, যত দ্রুত পারা যায় শহরে পৌঁছাতে হবে।

প্রথম ঝোপটা পেরিয়ে ডানে বাঁক নিতে গিয়েই জ্যাকের ঘোড়াটা আপনা আপনিই থেমে যায়। রাস্তার ঠিক মাঝখানে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার মুখ অন্যদিকে, জ্যাক শুধু তার পিঠ দেখতে পাচ্ছে। ক্ষীপ্রগতিতে

পিস্তলের দিকে হাত দিতে গিয়েই থেমে যায় সে। লোকটা তার চেয়ে ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে একটা শার্পস .৫০ এবং সেটা সোজা তাক করা আছে জ্যাকের বুক বরাবর।

গলার ভেতর কী যেন আটকে গেল জ্যাকের। ঢোক গিলতে গিয়েও গিলতে পারে না। কেবল অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে লোকটার দিকে। কিছু বলার জন্য মুখ খোলার চেষ্টা করতেই তাকে হাত দিয়ে থামিয়ে দিল লোকটা।

শার্পসটা নামিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে জ্যাকের দিকে তাকায় সে। তারপর খুব দৃঢ় পায়ে তার কাছাকাছি এসে পকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করে, একটা জ্যাকের হাতে দিয়ে অন্যটা সে ঠোঁটে রাখল। কানের পাশ থেকে একটা ম্যাচের কাঠি বের করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে জিন্সে ঘষা দিল। কাঠির মাথায় আগুনটা জ্বলে উঠতেই তা এগিয়ে দেয় জ্যাকের সিগারেট বরাবর, তারপর তার সিগারেটের দিকে। এসবের মধ্যেও লোকটার চোখ এক বিন্দুও সরে যায়নি জ্যাকের চোখ থেকে। সাপের মতো শান্ত চোখে সে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে খুব নরম গলায় লোকটা বলে, 'কেমন লাগছে, জ্যাক?'

জ্যাক কোনো কথা বলল না।

'কোনো ভয় নেই, জ্যাক। আমি তোমার মতো কাপুরুষ নই। পেছন থেকে গুলি করা কিংবা তিন পাশ থেকে তিনজন গুলি করে একজন মানুষকে মারা, অন্তত এ বর্বর স্বভাবটা আমার নেই। তা এ পর্যন্ত কতজন শেরিফ খুন করলে, জ্যাক?'

এবারও কোনো কথা বলল না সে। কেবল টের পেল তার সারা শরীর ভিজে গেছে, ঘাম গড়িয়ে পড়ছে আর শিরশির করছে।

'কিন্তু এভাবে আর কত দিন? সব পাপেরই একটা সীমা থাকে, জ্যাক। অবশ্য এ কথাটা তোমার জানা। পৃথিবীর সব জায়গাতে প্রতিপক্ষকে অন্তত একবার সুযোগ দেওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু তুমি তা দাওনি। এ অন্যায়, জ্যাক। বড় অন্যায়।'

ঠোঁট থেকে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে জিন্সের সঙ্গে হাত ঘষে নিল লোকটা। 'জ্যাক, আমি তোমার মতো কাপুরুষ নই। তুমি একটু পিছিয়ে যাও, আমি তোমাকে একবার সুযোগ দেব। এক দুই তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনই ড্র করব। তাতে হয় তুমি থাকবে, নয় আমি।'

জ্যাক মাথা নিচু করে ফেলে। কোনো কথা তো বললই না, এমন কি পিছিয়েও গেল না। নিঃশব্দে হাসে লোকটা। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'একজন সত্যিকারের মানুষই আরেকজন মানুষকে সম্মান করে, আমি নিজেকে মানুষ দাবি করি, জ্যাক। তুমি ভয় পেয়েছ, চলে যাও, ড্র করতে হবে না

তোমাকে।'

লোকটা একটু পিছিয়ে তারপর ঘুরে দাঁড়ায়। পা বাড়ায় সামনের রাস্তার দিকে। কিন্তু এক পা বাড়িয়েই সে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল। জ্যাক তার নিজের পিস্তলটা যেই খাপ থেকে তুলে এনেছে, তার আগেই সে দেখে এক টুকরো আগুন এগিয়ে আসছে তার দিকে।

ঘোড়া থেকে পড়ে যায় জ্যাকের দেহটা। লোকটা এগিয়ে আসে। হাঁটু ভেঙে জ্যাকের ঠিক সামনে বসে, 'বেঈমান, কাপুরুষ, সেই পিছন থেকে গুলি করা, গুলি করার চেষ্টা করা। শিট।'

লোকটা চলে যাচ্ছে। বাঁ পাশের বুকটা জোরে জোরে চাপ দিয়েও কিছু করতে পারছে না জ্যাক। গলগল করে রক্ত পড়ছে। চোখটা ঝাপসা হওয়ার আগে দেখতে পায় অন্ধ ভিক্ষুকবেশী সেই লোকটা অনেক দূরে চলে গেছে।

কারণ, এ এলাকার নতুন শেরিফ হিসেবে তাকে আজ দায়িত্বটা বুঝে নিতে হবে।

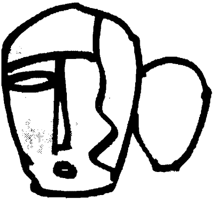

যে কথা যায় না বলা

অন্তীকে উজাড় করে ভালোবাসা দিয়ে মাঝে মাঝে আমার চুপচাপ মরে যেতে ইচ্ছে করে। কারণ, হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা পেয়ে ও যেন নিজেকে ভালোবাসার অভাবী না ভাবে। পূর্ণবতী হয় যেন সে। ইচ্ছা করে ওকে আমি বুকের ভেতর ভরে রাখি। সারাক্ষণ ও আমার বুক পুরে থাকবে আর আমার কথা ভাববে, দুষ্টুমি করবে, অভিমান করবে, আদরে আদরে ভরে দেবে আমার স্বপ্ন, অস্তিত্ব, বর্তমান।

সারাক্ষণ আমি ওর কথা ভাবি। ওর ভাবনায় কেটে যায় আমার শতমুহূর্ত, শতকাল।

যখন আমার একটু-একটু খারাপ লাগে তখন আমি ওকে ডাকি। ও কাছে এলেই আমার মনটা কেন যেন ভালো হয়ে যায়। মনেই হয় না আগে আমার মন খারাপ ছিল। ওকে সামনে বসিয়ে রেখে আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি। ওর চোখ দেখি, নাক দেখি, ভ্রূ দেখি, চুল—সব দেখি। ও চুপচাপ বসে থাকে। কখনো ঘাড় কাত করে, কখনো হাঁটুতে চিবুক রেখে, কখনো গালে হাত ঠেকিয়ে। আমার বুকটা তখন হাহা করে ওঠে। ভীষণ খালি হয়ে যায় ওই জায়গাটা। অন্তীকে জড়িয়ে ধরে তখন আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, আমি তোকে ভালোবাসি, অন্তী। কিন্তু আমি বলতে পারি না। একরাশ দ্বিধা এবং সংকোচ এসে থমকে দাঁড়ায়।

মাঝে মাঝে আমি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে যাই।

মনটা আজ কেন যেন খারাপ হয়ে আছে। সময় সময় মনটা এমন খারাপ হয়ে যায়, কেন যে হয়ে যায়, তার কোনো কারণ খুঁজে পাই না। উদাস-উদাস লাগে। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কখনো অনেক কিছু ভাবতে ভালো লাগে। কী ভাবি, বুঝি না, তবে ভাবি। ভাবতে ভাবতে মিনিট কেটে যায়, ঘণ্টা চলে যায়।

ইদানীং একটা বিষয় আমাকে অবাক করে। মন খারাপ হলেই কেমন করে যেন অন্তী টের পেয়ে যায়। হরিণের চঞ্চলতায় কিন্তু বিড়ালের নিঃশব্দতায় ও তখন আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। কপালে হাত রাখে, আমার চুলে মুখ ঘষে,

দুহাত দিয়ে মাথাটা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে।

আজও ও কাছে এসে দাঁড়াল। কপালে হাত রাখল। তারপর মূর্ছনার টুংটাংয়ের মতো বলল, 'কী ভাবছিস?'

মুখ তুলে ওর ফোটাফুল মুখটা দেখে আমার সমস্ত সত্তায় ভালো লাগার আবেশ ছড়িয়ে পড়ে। ওর হাতটা ধরে সামনে বসাই। তারপর হাত দুটি নিয়ে বুকে জড়াই। আশ্চর্য, মনটা ভালো হতে লাগল।

বললাম, 'তোর কথা ভাবছি।'

'আমি কি ভাবনার কিছু?'

'অবশ্যই, আমার সমস্ত ভাবনার।'

'দুর, তুই একটা পাগল।'

'হ্যাঁ, তোর কাছে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বয়ে যায়। অন্তীও কিছু বলে না, আমিও কিছু বলি না। শুধু ওর হাতটা নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করি, ও তখন ওর মাথাটা কাত করে আমার কাঁধে রাখে। আমার কী যে ভালো লাগে।

'অরণ্য, একটা কথা বলব?'

'বল।'

'রাগ করবি না তো?'

'দুর পাগলি, তোর ওপর রেগেছি কখনও?'

'তুই অন্য কাউকে তোর ভালোবাসা দিয়ে দে।'

'কেন? আর অন্য কাউকে ভালোবাসতে যাবইবা কেন? তাও আবার তোর কথা শুনে।'

'এমনি বললাম।'

ভীষণ রাগ হয় আমার। চোখ ফেটে জল আসতে চায়। কিন্তু ওর ওপর আমার রাগ হয় না। কারণ, ভালোবাসা। ভালোবাসার ওপর কি রাগ করা যায়। তবে অভিমান করা যায়। কিছুটা জোর করেই হেসে ফেলি। তারপর দু হাত দিয়ে ওর চুলের বেণী দুটো টেনে নিয়ে বলি, 'তুই ভাবিস আমি তোকে ভালোবাসি, মোটেও না।'

'আমি জানি।'

আশ্চর্য হয়ে যাই। বলে কি পাগলীটা! আমার সমস্ত ভালোবাসা যার জন্য জন্ম, সেই বলে কিনা এ কথা! একটু অভিমান হয়।

বলি, 'ঠিকই তো, তোর মতো প্রেতনীকে ভালোবাসতে আমার বয়েই গেছে।'

চোখ দুটো তুলে পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিতে অন্তী আমার দিকে তাকায়। শান্ত চোখ। ভেজা-ভেজা। শিশিরের মতো টসটসে। মনে হয়, নীল আকাশ, সারাক্ষণ মেঘ হয়ে ভেসে বেড়াই।

আমার সহ্য হয় না। আমি ওকে জড়িয়ে ধরি। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেই ওর কপাল, চুল, চোখ। কিন্তু তবুও বলতে পারি না, আমি তোকে ভালোবাসি অন্তী, ভীষণ ভালোবাসি, এই এক সাগরের সমান।

অন্তী হঠাৎ আমাকে ঠেলে দিয়ে চলে যায়। আমি তাকিয়ে থাকি। ওকে থামাতে চাই, কিন্তু পারি না। ওর চলে যাওয়া দেখে আমার কান্না পায়। ও তবুও চলে যায়।

আমি আবারও ভাবতে থাকি। কত কথা, কত ঘটনা। বর্তমান, অতীত। এই তো সেদিন এলাম। মফস্বলের ছাগমার্কা চেহারা, গোলাপ ফুল মার্কা একটা টিনের বাক্সে খুব যত্ন করে ধোয়া কিছু কাপড়, আর গ্রাম্য স্কুলের ভালো ছাত্রের ছাপমারা সনদপত্র নিয়ে। নতুন শহর, যা দেখি সব কিছু নতুন। মৃদু মৃদু পায়ে, কাঁপা কাঁপা হাতে ঠিকানাটা নিয়ে যখন খালার বাসার কলিং বেলে চাপ দিলাম, তখন কলিং বেলের শব্দের চেয়েও আমার বুকের ধুকধুক শব্দ জোরে হয়েছিল। বাড়ির চাকর দরজা খোলে দাঁড়ায়। তার অবজ্ঞাময় চাহনিতে আমি ঘামতে লাগলাম। খালার কথা বলতেই আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে দরজা বন্ধ করে লোকটা চলে গেল। অল্পক্ষণ পরেই খালা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। বুকের ভেতর আমার মাথাটা নিয়ে কাঁদতে থাকেন। আমার নিঃশ্বাস যত বন্ধ হয়ে আসে, খালা ততই আমাকে চেপে ধরেন। মায়ের গায়ের শান্ত সিগ্ধ গন্ধ খালার গায়ে। খালা কাঁদতে থাকেন, আমারও কান্না আসতে থাকে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি খালার পিছনে ফর্সা মতো একটা মেয়ে মিটিমিটি হাসছে। আমি ভুলে যাই, সব ভুলে যাই। হরিণের মতো অবাক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকি ওই মানবীর দিকে। ভাবি, ও এই পৃথিবীর না অন্য জগতের। অনেকক্ষণ পর খালা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলেন, 'তোর মা কেমন আছে?' আমি উত্তর দেই। খালা আবার কাঁদে। জড়িয়ে ধরে ভেতরে নিয়ে নরম গদিওয়ালা একটা চেয়ারে বসিয়ে বলেন, 'কতদিন তোদের ওখানে যাই না। মরার সংসার টানতে টানতে সময় চলে যায়। কত ছোট্টটি দেখেছিলাম তোকে, কত বড় হয়েছিস, দেখ এখনো তোর চেহারা মনে আছে।'

অবাক হয়ে আমি খালার দিকে তাকিয়ে থাকি। মেয়েটা ভেতরে চলে গেছে, হয়তো লজ্জা পেয়ে। আমার খালা, মায়ের আপন বোন। সম্পূর্ণ বিপরীত দুই ভুবন। খালার বিত্তশালী স্বামী, অট্টালিকাময় বাড়ি। আর আমার মা, গ্রামের একজন আদর্শবান শিক্ষকের স্ত্রী। আদর্শের প্রচণ্ড বাড়াবাড়িতে মাঝে মাঝে জীবনটা হাহাকার করে ওঠে। পৈতৃক জমিগুলোর ফসলেই রক্ষা।

খালা আমার গায়ে হাত বুলাতে থাকেন। তারপর মেয়েটাকে ডাকেন। তখনই জানলাম, ওর নাম অন্তী। আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আমার একমাত্র খালাতো বোন। এক ক্লাস নিচে পড়ে। আমার কেমন লজ্জা লাগে, মিটিমিটি হাসছে তখন মেয়েটি। কী অসভ্য রে!

অতঃপর কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়। তুমি থেকে তুই, মাস্টার থেকে বন্ধু, বন্ধু থেকে...। ধীরে ধীরে কাছে আসতে থাকে অন্তী। তারপর কাছে আসতে আসতে খুব কাছের হয় আজকের অন্তী।

আমি জানি, অন্তী রাগ করেনি, হয়তো অভিমান। ও কি কষ্ট পেল? নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো। এত কথা বলি, কিন্তু ওই সামান্য চার অক্ষরের কথাটা বলতে এত বাধা কেন? যে করে হোক আজ আমি ওকে বলবই।

পা টিপে টিপে আমি অন্তীর ঘরে ঢুকি। ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। কাঁদছে কি? দেখতে পাচ্ছি না। আস্তে আস্তে ওর পেছনে এসে দাঁড়াই। তারপর টুপ করে ওর চোখ দুটো চেপে ধরি। ও ওর হাত দুটো আমার হাতের ওপর চেপে ধরে। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি কিছু বলতে পারি না। শুধু ওর বিমুগ্ধ রূপটা দেখতে দেখতে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

বললাম, 'রাগ করেছিস?'

'দুর পাগল, তোর ওপর রেগেছি কখনও।'

'আমার কথাই আমাকে ফেরত দিচ্ছিস!'

অন্তী একটু কাছে আসে। তারপর দু হাত দিয়ে আমার ডান হাতের বাহু চেপে ধরে। ঘাড় হেলিয়ে আমার কাঁধে মাথা রেখে বলে, তোর ওপর রাগতে পারি? তুই আমাকে ভালোবাসিস কি না, তা জানি না, কখনও বলিসওনি, কিন্তু আমি তোকে প্রচণ্ড ভালোবাসি, ঠিক তোর মতো।

আমি বিমূঢ় হয়ে যাই, আনন্দ আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাঁপুনি তোলে, বুক ধড়ফড় করে, হৃৎপিণ্ড লাফাতে থাকে, চোখ ভিজে আসে। আমি অনেকক্ষণ সজল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

অন্তী কিছুটা লজ্জা পায়। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, 'অমনভাবে কী দেখছিস?'

'তোকে।'

'আমি কি তাজমহল নাকি?'

'তার চেয়েও সুন্দর।'

অন্তী হাঁটুতে কপাল ঠেকিয়ে মুখ ঢাকে। আমি ওর চুলে হাত বুলাই। ও ওর হাত দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে। কোনো কথা হয় না, কোনো শব্দ হয় না। বুকের একঘেয়েমি ধুকধুকিতে ঘেয়েমিটা ভালো লেগে যায়। অন্তীর মুখটা তুলে আমি বলি, 'অন্তী, ধর আমরা বিয়ে করে ফেললাম।'

'ফেললাম।'

'তুই কি তখনো আমাকে তুই বলবি?'

'না, তোকে ডাকব তুতু করে।'

'মানে?'

'সহজ। তুই-এর তু আর তুমির তু। একেবারে খাসা ডাক।'

'তাই বলে কুকুরকে মানে একটা জানোয়ারকে ডাকার মতো আমাকে ডাকবি!'

'তুই তো একটা জানোয়ারই।'

'জানোয়ার?'

'হ্যাঁ, আমার কাছে। আমার প্রাণের জানোয়ার, মনের জানোয়ার, আমার অস্তিত্বের জানোয়ার, আমার বেঁচে থাকার জানোয়ার।'

আবারও অবাক হই আমি। বলতে ইচ্ছে করে, 'আমি তোকে ভালোবাসি, অন্তী।' কিন্তু বলা হয় না।

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি। আমরা আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছি। নদীতে ভেসে যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি কোনো অলৌকিক ভুবনে। সেখানে কেউ নেই। শুধু আমি আর অন্তী, অন্তী আর আমি।

অন্তীকে একটু কাছে টেনে নিই। আলতোভাবে হাত রাখি ওর নরম চুলে। আস্তে আস্তে হাতটি নেমে আসে ওর কপালে-ভ্রূতে। চিবুকে। চোখ দুটো খুলে অল্পক্ষণের জন্য তাকায় অন্তী। স্বর্গের আলোয় উদ্ভাসিত দুটি চোখ। হাতটা নেমে আসছে আরো নিচে। থির থির করে কাঁপছে ঠোঁট দুটো। শিরায় শিরায় বেড়ে যাচ্ছে রক্তের গতি। অনুভব করছি, নিজের অস্তিত্বের মাঝে মিশে যাচ্ছে অন্তী। আস্তে করে নামিয়ে আনি নিজের ঠোঁট জোড়া। মাতাল হলো হাওয়া। হৃদয়ের মাঝখান দিয়ে বইতে লাগে শান্তির ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, সুখের ধারা। ফুটে উঠল ফুল, স্বর্গীয় এক প্রশান্তিতে ভরল হৃদয়।

অন্তীর চোখে চোখ রাখি। ওর চোখ দুটো চিকচিক করছে। চোখের কোনায় জমে উঠেছে মুক্তোদানা। টুপ করে গড়িয়ে পড়ল সেটা। অসম্ভব কষ্ট হলো আমার। বললাম, 'তুই কাঁদছিস?'

'এ আমার আনন্দের কান্না।'

নির্বাক, নিথর হয়ে আমি তাকিয়ে থাকি অন্তীর দিকে। হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন অনুভব করি। এ আমার অন্তী, আমার প্রাণের অন্তী। 'আমি তোকে ভালোবাসি অন্তী, ঠিক তোর মতো।' চিৎকার করে বলি এ কথাটা। আমার আর সংকোচ হয় না, লজ্জা হয় না।

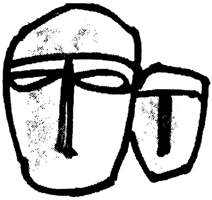

রবাহূত

হ্যালো, মি. চৌধুরী।

– কে বলছেন?

: আমি আপনার একজন গুণগ্রাহী।

– নামটা বলবেন, প্লিজ।

: বলব, তার আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এত রাতে বিরক্ত করার জন্য।

– না না, ঠিক আছে। তা আপনি আমার মোবাইল নম্বর পেলেন কোথায়?

: পেয়ে গেলাম আরকি! তা ছাড়া বিখ্যাত লোকদের টেলিফোন নম্বর পাওয়া কি খুব কঠিন ব্যাপার?

– ঠিক তা নয়। মাত্র অল্প কয়েকজনই আমার এ নম্বরটা জানে কিনা।

: ধরে নিন সে অল্প কয়েকজনের মধ্যে আমি একজন।

– তা আপনার নামটা বললেন না?

: তার আগে বলুন আপনি কেমন আছেন?

– ভালো, তবে ব্যস্ততা যাচ্ছে।

: তা তো যাবেই। পুরনো একটা বাড়ির সঠিক ইতিহাস জানা সত্যি এক কঠিন ব্যাপার।

– এ ব্যাপারটাও জেনে গেছেন!

: মি. চৌধুরী, এ জগতে সবকিছুই জানা সম্ভব, যদি কেউ জানতে চায়। তা কিছু পেলেন?

– জি, এরই মধ্যে বেশ কিছু জানতে পেরেছি।

: বেশ কিছু? তা কী কী পেলেন?

– দুঃখিত, আপনাকে বলা যাবে না। আচ্ছা, আপনি কে বলুন তো?

: বলব।

– আমি আবারও দুঃখিত। এখন মনে হচ্ছে আপনি সত্যি সত্যি আমাকে বিরক্ত করছেন।

: আমি তো আপনাকে সাহায্যও করতে পারি।

– সম্ভবত আপনার সাহায্য আমার দরকার নেই।

: আছে মি. চৌধুরী, আছে। আপনি এ কদিন গবেষণা করে যা জানতে পেরেছেন, তার চেয়ে বেশি আজ আপনাকে জানাব।

– প্লিজ, বলুন তো আপনি কে? এই মধ্যরাত্রে...।

: হা...হা...। আপনি খেয়াল করেছেন চৌধুরী, আপনার কপালে বেশ কয়েকটা ঘামের বিন্দু জমেছে!

– আঃ... হ্যাঁ...হ্যাঁ...। কিন্তু কে আপনি?

: আপনার বাঁ গালে একটা মশাও বসেছে মি. চৌধুরী, রক্ত খাচ্ছে।

– ইয়ে ...।

: পুরুষত্ব নিয়ে আপনি গবেষণা করে যতই সাফল্য লাভ করুন না কেন, পুরনো এ বাড়ি সম্বন্ধে আপনি তেমন কিছু জানতে পারবেন না, যদি আমি আপনাকে না জানাই।

– আপনি কী কী জানেন?

: অ-নে-ক কিছু। এ বাড়িটা কার জানেন?

– হ্যাঁ, হারাধন ব্যানার্জির।

: ইয়েস, আপনার পেছনে যার ছবি টাঙানো আছে।

– জি।

: তিনি কত বছর আগে মারা গেছেন?

– না, এই তথ্যটা সঠিকভাবে জানতে পারছি না।

: দুই শ ছত্রিশ বছর আগে।

– রিয়েলি?

: সিওর।

– আপনার কথা কীভাবে বিশ্বাস করি?

: সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার।

– ধন্যবাদ।

: চৌধুরী সাহেব, আপনি আজ প্রায় কয়েক সপ্তাহ ধরে এ বাড়িতে আছেন, কাজও করছেন অনেক রাত পর্যন্ত। কিছু টের পেয়েছেন?

– হ্যাঁ, প্রচুর ইঁদুর রয়েছে এ বাড়িতে, সাপ-টাপও থাকতে পারে।

: না, ওগুলো ইঁদুর...। একটু মনোযোগ দিন, কিছু শুনতে পাচ্ছেন?

– হ্যাঁ, নূপুরের শব্দ।

: আপনি একটু এগিয়ে যান, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠুন। বাম পাশের ঘরটা পার হয়ে আরো একটু এগিয়ে যান সামনের দিকে। তারপর একটা ঘর। আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে ফেলুন। যাচ্ছেন?

– জি।

: আরো একটু এগিয়ে যান। হ্যাঁ, সামনের বড় ঘরটাই। এবার দরজাটা খুলে ফেলুন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

– প্রচুর ধোঁয়া তো ঘরের ভেতর!

: হ্যাঁ, একটু ভালোভাবে তাকিয়ে দেখুন।

– হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। ও মাই গড, এত মেয়ে এলো কোথা থেকে? অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচছে সব।

: এবার আপনি ডান দিকের পথ ধরে এগিয়ে যান। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা কুঠুরি দেখতে পাবেন। দয়া করে কোনো শব্দ করবেন না। কুঠুরির ছোট্ট দরজাটা আপনা আপনি খুলে যাবে। হ্যাঁ, এগিয়ে যান।

– একি! এসব কেন কুঠুরির ভেতর?

: সাত শ বছর জমিদারি করে চ্যাটার্জি পরিবার যে সোনাদানা সঞ্চয় করেছিল, তা গচ্ছিত আছে ওখানে। এই কুঠুরি নেমে গেছে মাটির অনেক নিচ পর্যন্ত। আপনি ভাবতে পারেন, ওখানে কত সোনা আছে?

– আইডিয়া করতে পারছি না।

: এবার বলুন মি. চৌধুরী, যে দরজাটা প্রায় দুই শ বছর ধরে কেউ খুলতে পারছে না, ঘরের ভেতর কী আছে জানতে পারছে না, তা আমি আপনাকে নিমিষেই দেখিয়ে দিলাম, এতে কি উপকার হলো না?

– ধন্যবাদ আপনাকে।

: আপনার পেছনে যে ঘরটা রয়েছে, ওটা হচ্ছে একটা হলরুম। আপনি অবশ্য জানেন, জমিদারি চালাতে হলে অনেক কিছু করতে হয়।

– এখানে কী হতো?

: দরজাটা খুলেই দেখুন।

– দরজায় তো তালা লাগানো।

: অন্য দরজাগুলোতেও তালা লাগানো ছিল, তবুও খুলে গেছে। আপনি দরজার সামনে দাঁড়ান; হ্যাঁ, দরজা খুলে গেছে।

– আঃ এসব কী! এতগুলো মানুষের মাথা!

: হ্যাঁ, এগুলো তাদেরই মাথা, যারা জমিদারি হুকুম মানতে চাইত না।

– এ তো বর্বরতা!

: হ্যাঁ, আপনাদের আধুনিক যুগেও তো হত্যাকাণ্ড চলছে। তবে ঠিক এভাবে নয়, অন্যভাবে। না না, এগিয়ে যাবেন না, অসুবিধা হবে। আপনি এ ঘর থেকে বের হয়ে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যান। হ্যাঁ, আরো একটু সামনে। এবার বলুন, আপনি কি কিছু শুনতে পাচ্ছেন?

– কে যেন কাঁদছে।

: হ্যাঁ, কাঁদছে। প্রতিটি শাসন আমলেই কিছু কিছু মানুষকে অবরুদ্ধ করা হয়। কান্না ছাড়া তাদের আর কিছু করার থাকে না, এরা তারা। কেন, আপনাদের এই সময়েও কি তা হচ্ছে না?

– হয়তো।

: মি. চৌধুরী, এবার আপনি ঠিক আগের জায়গায় যাবেন।
– কিন্তু আমি তো যেতে পারছি না। কে যেন আমাকে টেনে ধরেছে।
: পেছনে তাকিয়ে দেখুন।
– না।
: একবার তাকিয়ে দেখুন।
– না।
: ভয় পেলেন চৌধুরী?
– ন-না...।
: ঠিক আছে, আপনি আবার হাঁটতে শুরু করুন।
– সামনে যেন কে দাঁড়িয়ে আছে?
: কথা বলুন।
– কী বলব, সারা দেহ তো কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা।
: কাপড়টা সরাতে বলুন।
– না।
: আহ্ বলুন।
– না, ও তো এগিয়ে আসছে।
: তাহলে আপনিও পিছাতে থাকুন।
– দৌড়ে আসছে ও।
: আপনিও দৌড়াতে থাকুন।
– আহ্, আমি আর পারছি না।
: পারতে আপনাকে হবেই মি. চৌধুরী। অন্তত এই বাড়ির শেষ ইতিহাসটা আপনাকে জানতে হবে।
– না, ওকে আর দেখা যাচ্ছে না।
: সত্যি!
– হ্যাঁ।
: আপনার সামনের দেয়ালটার দিকে তাকান।
– হ্যাঁ, ধূসর একটা দেয়াল।
: একটু ডানদিকে তাকান।
– দেয়ালের ওপরের দিকে একটা ফাটল।
: কিছু দেখতে পাচ্ছেন?
– না।
: ভালোভাবে দেখুন।
– হায়! গলগল করে রক্ত ঝরছে।
: ওসব কাদের রক্ত জানেন?
– না।

: জানেন না?

– না।

: শোষিত মানুষের ঘামই রক্ত হয়ে গেছে।

– ওই তো ও আবার দাঁড়িয়ে আছে।

: মি. চৌধুরী, আপনি আর এক মুহূর্ত দেরি করবেন না। দৌড়াতে থাকুন। দৌড় দৌড়...।

– হাহ-হাহ-হাহ, আমি আর পারছি না।

: পারতেই হবে আপনাকে।

– না... নাহ...।

: এবার থামুন, চৌধুরী। আপনার গলার কাছে হাত দিন।

– আহ, রক্ত!

: হ্যাঁ, রক্ত। ব্যথা লাগছে?

– একটু একটু।

: মি. চৌধুরী, এবার একটু ডানে তাকান। কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

– হ্যাঁ, কারা যেন সারিবদ্ধভাবে হেঁটে যাচ্ছে।

: ব্যানার্জি পরিবারের সব সদস্য।

– কিন্তু ওদের হাত-পা বাঁধা কেন?

: পাপ।

– আমি একটু কাছে গিয়ে দেখব?

: খবরদার, ওরা টের পেলে অসুবিধা হবে।

– আমি এখন কী করব?

: দেখুন তো কোনো শব্দ শোনা যায় কি না?

– হ্যাঁ, কে যেন শিস বাজাচ্ছে।

: একটু ঘুরে দাঁড়ান।

– সেই লোকটা।

: আবার দৌড়াতে শুরু করুন, মি. চৌধুরী। হ্যাঁ হ্যাঁ, দৌড়ান।

– ওহ, ওহ, আর পারছি না। বুক ফেটে যেতে চাচ্ছে। আর পারছি না...। লোকটা কে?

: হারাধন ব্যানার্জি।

– কে, কে?

: হারাধন ব্যানার্জি।

– অসম্ভব, তিনি তো মারা গেছেন দুই শ ছত্রিশ বছর আগে।

: সত্যি!

– তাহলে?

: সামনে তাকান।

– লোকটা আবারও দাঁড়িয়ে আছে।

: আর কিছু?

– ও ওর মুখের কাপড়টা সরাচ্ছে।

: হ্যাঁ, তাকিয়ে থাকুন।

– আঃ!

: চিনতে পেরেছেন?

– হ্যাঁ হ্যাঁ, হারাধন ব্যানার্জি।

: হ্যাঁ।

– তাহলে আপনি কে?

: আমিও হারাধন ব্যানার্জি।

– এ কী করে সম্ভব?

: তা তো জানি না। শুধু এটুকু জানি...।

– কী... কী..?

: আপনি জানেন মি. চৌধুরী, এ বাড়ির একটা বিশেষত্ব আছে?

– বিশেষত্ব আছে কি না জানি না, তবে একটা দুর্নাম আছে।

: কী সেটা?

– এ মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।

: আমি বলে দিচ্ছি। প্রতি একুশ বছর পরপর একটা বিশেষ দিনের বিশেষ সময়ে এ বাড়িতে একটা লাশ পাওয়া যায়।

– হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

: গুড। আজ সেই দিন, সময়টাও হয়ে গেছে। আর লাশ হওয়ার মানুষটাও পেয়ে গেছি। তা মি. চৌধুরী, আপনি প্রস্তুত তো?

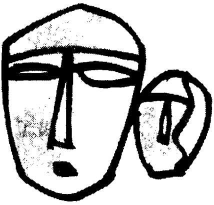

কেবলই

ট্রেনের শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়। পাশে রাখা ট্রাভেল ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে চারপাশে চোখ বোলায় একবার। তারপর সামনে এগোতে থাকে ধীর পায়ে। রেললাইনের ঠিক কাছাকাছি এসে কী যেন ভাবে কিছুক্ষণ। তারপর আরো একটু এগিয়ে গিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে রেললাইনের ঠিক মাঝখানে। শান্তভাবে ব্যাগ থেকে একটি কাগজ বের করে পড়তে পড়তে তাকায় সামনের দিকে। ট্রেনটা এগিয়ে আসছে। দ্রুত।

ঘুমানোর আগে ছেলেটা প্রতিদিন একটা স্বপ্নের কথা ভাবে, সরল স্বপ্ন। ঘুমিয়ে পড়ার পর সে ওই স্বপ্নটা দেখে, প্রতিদিন। তারপর এক সময় আলস্যভরা ঘুম ভাঙে তার খাঁ খাঁ রোদের সকালে। স্বপ্নের ধারাবাহিক ব্যর্থতা আর অবিচ্ছিন্ন কল্পবোধের নিঃসঙ্গ শূন্যতা খেলা করে মাথার ভেতর। এ সময় নিজেকে বড্ড অপাঙ্‌ক্তেয় মনে হয় তার, সংসারের ছাই ফেলার ভাঙা কুলোর মতো নিতান্তই অবহেলিত।

ঝিম মেরে বসে থাকে সে কিছুক্ষণ। মাটির দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবে। হয়তো কৈশোরের কথা। বকুলতলার বকুল ফুল। কাঁচা আমের অলস দুপুর। ডাংগুলি আর গোল্লাছুট। ঘোলাজলের খালের বুকে ন্যাংটো ঝাঁপুর-ঝুঁপুর। ধুলোর ধোঁয়ায় পথের হাওয়ায় সিপারা হাতে মক্তবে গমন। ‘পরওয়ারদেগার আমাদের আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।’ হুজুরের পান খাওয়া কালো দাঁতের ফেনা তোলা মুখ। কত কী! অ-তে অজগর, আ-তে আম। তারপর বই বগলে ইশকুলে। অতঃপর ‘বড় হইয়া আমি ডাক্তার হইবো’—জীবনের লক্ষ্য রচনায় ঝুঁকে ঝুঁকে পড়া, আর ডাক্তার হওয়ার অনাগত সুখে অনবরত স্বপ্নের সিঁড়ি ডিঙানো।

ঘটাং।

পাশ ফিরে তাকায় ছেলেটি। ন্যাতানো কটি রুটি আর থালার কোনায় পড়ে থাকা কিছু ভাজি। দৃষ্টিটা একটু উপরে তুলতেই মায়ের শান্ত-গম্ভীর মুখ। বাজারের টাকা আর তার চেয়ে বেশি ওজনের ফর্দ হাতে দাঁড়িয়ে।

শুরুটা এ রকমই।

প্রতিদিন।

তারপর ধার করে পড়া কোনো দৈনিক পত্রিকা। কর্মখালি, নিয়োগ আর রাশিফলে ভাগ্যের সাপলুডু খেলা। কোথাও ধর্ষণের ব্যবচ্ছেদ বিবরণ, ছেলেধরা, গণপিটুনি, সন্ত্রাস, ছিনতাই কিংবা তুমুল তর্কঝড়ের পূর্বাভাস—দেশ ঠিকমতো চলছে তো?

অথবা কোনো চায়ের দোকানে বিরতিহীন আড্ডা। রিকশাওয়ালা, মজুর, হকার আর তারই মতো অনেকের সহাবস্থান। শত সুখ-দুঃখের কথোপকথন। চালের দাম বেড়েছে, লোডশেডিং, সব শালাই ধান্দাবাজ।

কিংবা অফিসপাড়ার কোনো এক উচ্চপদস্থ আত্মীয়ের নিরন্তর কপাল কোঁচকানো মুখ দেখেও ধরনা দেয়া, কাতর মুখে বসে থাকা, অল্প মিষ্টির আধকাপ চা, তারপর আশা-নিরাশার দোলনা বেয়ে হতাশ বদনে ফিরে আসা।

ক্লান্ত দুপুরের তপ্ত ফুটপাত। ঝিমিয়ে পড়া রোদ। তারই মধ্যে পচা কাঁথায় মোড়ানো কোনো নুলো ফকির, ঘামে ভেজা প্যাডেল পায়ে কোনো রিকশাওয়ালা, শুকিয়ে যাওয়া কিছু শাক-পাতা ঝাঁকায় নিয়ে কারো বসে থাকা অথবা তীব্র চিৎকারে শিস কেটে কোনো মুমূর্ষু রোগী নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের ছুটে যাওয়া—মানুষের প্রাণান্তকর বেঁচে থাকার নির্লজ্জ সাধ, আহ্, সবাই বাঁচতে চায়।

ঘুম-ঘুম আবেশে নেতিয়ে পড়া শরীর। ইচ্ছেমতো ব্যাসার্ধ নিয়ে কোনো পার্কের গাছতলায় বসে পড়া। উদাস চোখে কারো প্রতীক্ষা, চকলেটের পলিথিন হাতে কোনো শিশুশ্রমের মডেল, পানির জগ আর গ্লাস নিয়ে আগামী দিনের হাতবদল হওয়া কোনো নারী, কোথাও অন্তরঙ্গভাবে বসে থাকা কোনো মানব-মানবী, টুকটাক কথা বলা, খুনসুটি কিংবা ঝটিতি একটা চুমো।

এ সময় বড্ড মন খারাপ হয়ে যায় তার। চোখের সামনে স্মৃতিগুলো দুলতে থাকে পেন্ডুলামের মতো। বিদুষী আর সে, কতদিন ক্লান্ত দুপুরে হেঁটে হেঁটে বেড়িয়েছে, পার্কে বসে কাটিয়েছে ছায়াঘেরা কত গাছতলায়, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে নদীর জল দেখেছে কতবার। বিদুষীর বড় শখ ছিল, অনেকদিন বলেছে, তাকে নিয়ে একদিন নৌকায় বেড়াবে, সারা দুপুর। নদীর জলে ঝিকমিক রোদ, মাঝির ভাওয়াইয়া গান আর নৌকার গলুইয়ের ভেতর তারা দুজন। তারপর?

বিদুষী কোনো জবাব দেয়নি। তাই সে ইশারা করে কী যেন বুঝিয়েছিল তাকে। লজ্জায় লাল হয়ে ছিল বিদুষী কয়েক মিনিট। তারপর আরো কত কী!

তীক্ষ্নস্বরে কী যেন একটা পাখি ডেকে ওঠে। ফুলের মিষ্টি গন্ধের মতো ভাবনাগুলো মিলিয়ে যায়। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় সে। স্বপ্নাবিষ্টের মতো

আবার সে হাঁটতে থাকে, খসখস-খসখস। মৃদু হাঁটার ক্লান্ত শব্দে ১২...১...২...।

দুপুরে বাড়ি ফিরে কেমন যেন চুপচাপ হয়ে যায় সে। একা একা বসে থাকে অনেকক্ষণ। একদম কোনো কিছু করার থাকে না তখন। কেমন যেন অস্থির ভাব। মাঝে মাঝে দম আটকে আসে। সবাই কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত, কেবল তার কোনো কাজ নেই। চুপচাপ।

উঠে দাঁড়ায় সে। ঘরের ভেতর পায়চারি করতে থাকে। কোনায় পড়ে আছে কিছু পুরনো পত্রিকা। তুলে নেয় একটা। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে। বিরক্তিতে সেটা আবার ফেলে দেয়। সেখানেই। বড্ড যন্ত্রণাদায়ক নিঃসঙ্গতা।

অলসতা জাপটে ধরে তাকে। শুধু একটা ভাবনা—একটা কিছু করা দরকার, একটা কিছু...। কিন্তু কী করবে খুঁজে পায় না। কেবল অনর্থক বেলা কেটে যায়, ফাঁকা-ফাঁকা, সব ফাঁকা।

ইদানীং নিদ্রাহীন স্বপ্নে কেটে যায় অনেক দুপুর। অদ্ভুত সে স্বপ্ন। জীবনের সব ফুল গেঁথে আছে এক সুতোয়। সে এক কাব্যগাথা মালা। শঙ্খসাদা কোনো এক উর্বশী নারী।

কখনো সে স্বপ্ন ডানা মেলে নিঃশব্দ আকাশে। অসীম আনন্দে দৃশ্যহীন সাজায় জীবনের প্রহর। কত সুন্দর! কত মনোরম!

অথচ সব পড়ে রয়। অনাবাদি জমির মতো খাঁ খাঁ করে জঞ্জাল। কষ্টের নিঃশব্দতায় সে থাকে একা। টেনে টেনে যাওয়া জীবনের সব স্থবিরতা, হঠাৎ নিজের ছায়ায় নিজেরই চমকে ওঠা। এ কি মানুষ নাকি জীবন্ত এক ফসিল? কেবল চেতনার ভেতর প্রশ্ন জাগে, জটিল প্রশ্ন। জাগে পশু হওয়ার তীব্র বাসনা। বেপরোয়া সে সাধ, বিধ্বংসী সাধ।

ক্যাঁচ।

আধভেজানো দরোজায় মৃদু শব্দ। ক্ষমার অপার স্নেহে খাবার হাতে মা, অভাবী চাহনি, তারপর টপটপ চোখের জলে প্রতিনিয়ত জিজ্ঞাসা, একটা কিছু হলো, কিংবা আর কত দিন?

জবাবহীন চুপচাপ খাওয়া বিস্বাদ খাবার। তারপর নিঝুম দুপুরে আয়েশি এক কর্মহীন ঘুম, সময় চলে যায় ৩...৪...৫...।

বিবর্ণ হয়ে যায় এই সময়টা। অন্তর্গত এক অবোধ শূন্যতা আঁকড়ে ধরে তাকে।

কতদিন এমনি বিকেলে সে নদীর গান শুনেছে। নদীর কী মিষ্টি মিহি গান! আহা! নদীর গান কি সবাই শুনতে পায়! ভালোবাসার অমোঘ বিষ যে পান করে সেই জানে বিষের স্বাদ। তাই নীল ঘাস ফুল, বাতাসের শিস, নদীর গান,

কাশফুলের হাতছানি, সব কিছু কত জীবন্ত।

আর সূর্যাস্ত!

ষোড়শীর ঠোঁটের মতো লাল সূর্যটা হেলতে হেলতে এক সময় ডুবে যায়। কী শান্ত তার অন্তর্ধান, কী নীরব তার চলে যাওয়া। কাঁধে মাথা রাখা বিদুষীর চোখে দেখেছে সে সূর্যাস্তের শেষ লাল আভা।

কোনো কোনো দিন একা কেটেছে। একা একা চলেছে কত গন্তব্যহীন পথ। বিষণ্ণ বিকেল। ভাবনায় কত বসন্ত। হায়! কত যুগল হেঁটে যায়, হাতে রেখে হাত, অথবা কত চর্বিওয়ালা সুখী মানুষের নিরুদ্বেগ বৈকালিক ভ্রমণ, এই সব সুখী মানুষ।

আর, আর ওই যে ছোট্টকালের বিকেল। উত্তম, যার প্রতিটি বিকেল ছিল ঘুড়ি ওড়ানোর। উত্তম ছিল ওর বন্ধু। কী অদ্ভুত উপায়ে উত্তম ঘুড়ি ওড়াত, প্রতিদিন অন্যের তিনটা ঘুড়ি অন্তত ও কেটে দিত। এ রকম একদিন বিকেলে উত্তমের সাথে তার শেষ দেখা হয়েছিল। সেদিন রাতে ওরা ভারতে চলে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি।

উফ, কেন যে এ সময় মনটা অকারণে কেমন করে! শূন্যতার ছড়াছড়ি চারপাশে। রাজহাঁসের মতো দুলে দুলে চলে কোনো এক্সিকিউটিভের বধূ, পাশে পাশে পাহারাদার হয়ে গর্বিত চেহারায় স্যুট-টাই পরা মিস্টার এক্সিকিউটিভ। কোনো পার্টি, কিংবা আলো-আঁধারিতে কোনো চায়নিজ। কী নিশ্চিত জীবন!

রাস্তায় এখন বেশ ভিড়। অফিসফেরত মানুষের দৈনন্দিন মহড়া। নয়টা-পাঁচটা। পলিথিনে করে কেউ বাজার ভরেছে, কারও হাতে খাবারের আলগা ক্যারিয়ার।

নাহ! কিছু ভালো লাগছে না। ছেলেটি দু হাত দিয়ে মাথার চুল টানতে থাকে। আপাতত কিছুই চায় না সে, শুধু একটা কাজ। যেকোনো কাজ। দাসত্বের শৃঙ্খলে নিজেকে বেঁধে ফেলে, তবুও।

চোখ দুটো কেমন যেন শিরশির করছে। জ্বলছে একটু একটু। ফেটে জল আসতে চাচ্ছে চোখ দুটোতে। সবারই কিছু না কিছু হয়, কেবল তার কিছু হয় না।

দূরে সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে। অন্ধকার ধীরে ধীরে গ্রাস করছে দিনের আলোকে, ধীরে ধীরে জ্বলে উঠছে রাস্তার বাতিগুলো।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে ছেলেটি। একঝাঁক পানকৌড়ি উড়ে যাচ্ছে সন্ধ্যার আকাশে। দূরে কোনো মসজিদ থেকে আজান ভেসে আসছে। বিষণ্ণতায় কেটে যায় আরেকটি বিকেল—৬...৭...।

কোনো কোনো সন্ধ্যায় ছেলেটির অদ্ভুত কিছু ইচ্ছে জাগে। জ্যোৎস্নাভরা রাত কিংবা বাউলগানের আসর।

আর এই যে নীতিকথা শোনার সান্ধ্য আড্ডা, প্রলেতারিয়েত, পুঁজিবাদ, লেনিন, মার্কস—কত কথা। জীবনের শ্রেষ্ঠতম আবেগ জাগানিয়া সময়। সব পাথর চিবিয়ে ভাঙার কাল। সে এক সময় বটে!

সেসব এখন কেবল বাতিল অতীত। শুধু হাহাকার করা দীর্ঘশ্বাস। কেবলই আঁধার হাতড়ে আলো খোঁজা, নিরর্থক পথ চেয়ে সময়ের নিষ্ফল পচন। বড্ড লজ্জা হয়। কষ্টও।

বিনয়দার বিপ্লবী ভাষণ, সবুজ ভাইয়ের নীতিকথা, আনন্দ চৌধুরীর সততা—সব আজ সুবিধাবাদীর মোড়কে ঢেকে গেছে। বিনয়দার সে বিপ্লবী ভাষণ আর নেই, তিনি এখন ফিসফিস করে কথা বলেন, নিজের আত্মার কলুষ ঢাকতে সৎ মানুষের লেবাস ধরেন। সবুজ ভাইয়ের এখন নীতিকথা বলার সময় নেই—টেন্ডার, প্রজেক্ট, প্রোপোজাল, ব্যাংক লোন নিয়ে মহা ব্যস্ত—যাকে দেখলে ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসত, বড় ঘৃণা হয় এখন তাকে। আনন্দ চৌধুরী এখন আনন্দ করে বেড়ান প্রতিনিয়ত, সেসব অসৎ আনন্দ, নষ্ট আনন্দ, দু পকেট বোঝাই করা টাকা ছিটান এখানে-ওখানেঐ অদ্ভুত সে পাল্টে যাওয়া।

পাল্টে গেছে ছেলেটি নিজেও। মা বলতেন, ভালো ছেলেরা সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফেরে। সেও ফিরত। আর এখন?

সন্ধ্যার পর কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে আড্ডার অজস্র কথোপকথন—রাজনীতি, অর্থনীতি, শেয়ারবাজার, মঙ্গলগ্রহ। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে যায় বিশুদ্ধ পরিবেশ। হতাশার কালো ছায়ায় মুখ ঢেকে যায় নীরবে। তারপর থমকে যাওয়া সময়ের অস্থির স্বপ্নে তবুও জাল বুনতে বুনতে পথচলা, ঘরে ফেরা—৮...৯...১০...।

টেবিলের কোনায় পড়ে থাকা ঠাণ্ডা ভাত, বাটিতে সামান্য তরকারি আর গ্লাসে ঢাকা চকচকে পানি। রাতের বরাদ্দ করা খাবার খেয়ে সে এক ভাবনা, তারপর?

মাঝরাতের বাতাস কেমন যেন বিষণ্ন। ঝিরিঝিরি তার নীরব বয়ে যাওয়া। কোথাও কোনো অসুস্থ মানুষের আর্তনাদ, করুণ শোনায় তার গলার স্বর। কোথাও রাস্তায় কুকুর ডাকে, কার দুঃখে যেন কাঁদছে। কোথাওবা কোনো শিশুর রাত্রি জাগরণের চিৎকার অথবা কোনো বৃদ্ধের খকখক কাশির দম আটকে আসা নিঃশ্বাস। ঝিঁঝি পোকা ডাকে, অন্তহীন তার চ্যাঁচানি। আর রাতজাগা পাখির নিঃসঙ্গ কথন।

এরই মধ্যে সে। নিশাচরের মতো প্রতিদিন। এপাশ-ওপাশ। কেমন যেন

নতজানু দেহ, পাঁজরভাঙা পশুর মতো গোঙানি। বড় ইচ্ছে করে নির্বাসনে যাবার। মুচড়ে ওঠা শূন্যতা আর অপ্রাপ্তির হাহাকারে চলে যাবার।

আর ভালো লাগে না। কতদিন আর এ সকরুণ বেকারত্ব। আটপৌরে ইচ্ছেরা সব মিশে যায় শূন্যে। মানুষের অবহেলা, প্রত্যাখ্যান আর অপমানের সৌধে গড়া এ অবোধ সময়। এবার নিষ্কৃতি দরকার। নয়তো...নয়তো!

আদিযুগ থেকে মানুষের ক্রম-অগ্রযাত্রা। অতঃপর রেনেসাঁ, হিমালয়-জয়, চাঁদ-দখল, ইন্টারনেট, ক্লোনিং, মঙ্গলে পাথফাইন্ডার—সভ্যতার বিকাশে নিরন্তর এগিয়ে যাওয়া। মানুষ সব পারে!

তবুও।

তবুও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের সীমাহীন কিছু সীমাবদ্ধতা। থমকে যাওয়া সময়কে দু হাতে না সরিয়ে দিতে পারার এক ক্ষমাহীন অক্ষমতায় শুধু দিন বয়ে যায়, রাত কেটে যায়। স্বাপ্নিক এক ইচ্ছেপাগল যুবকের স্বপ্ন দেখার রাত্রি ১১...১২...ঢং ঢং ১...২...৩...।

বাতাসে একটু একটু নড়ছে কাগজটি। সূক্ষ্ম সুখ-জাগানিয়া কাগজ। অনেক ইন্টারভিউ, অনেক তদবির, অবশেষে তার একটা চাকরি। তার নিয়োগপত্র।

কাজে যাওয়ার আগে স্বপ্নগুলো জেগে ওঠে তার। নিজের দুঃখগুলো ধীরে ধীরে ঝরে যায় শূন্যে। আহ! একটা চাকরি। তারপর স-ব। কেমন যেন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে জীবনটা।

কিন্তু?

কিন্তু এ সবই নিজের জন্য! মানুষের এ জন্ম সে কি শুধু নিজের জন্য? নাকি সবকিছু সবার জন্য?

যদি তা-ই হয়?

ছোট বোনটা একটা লাল জামার জন্য কেঁদেছিল তিন দিন। কিনে দেয়া হয়নি। অসামর্থ্য। তার একদিন বিয়ে হলো, বাচ্চা হতে গিয়ে মারাও গেল। সে তো আর কোনো দিন লাল জামা চাইবে না। তাহলে!

বাবার চোখের ছানি কাটা বড্ড প্রয়োজন ছিল। কাটা হয়নি টাকার অভাবে। অন্ধ হতে হতে একদিন চলেই গেলেন। বাবার ছানিটা তো কাটা হয়নি? তবে!

বাঁ দিকে অবশ হওয়া মা শুয়ে থাকে সারাক্ষণ। হয়তো ভালো করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সুযোগ হয়নি। অভাব। মা তো আর কোনো দিন ভালো হবে না। কী হবে?

ছোট ভাইটা কীসব মানুষের সাথে মিশতে মিশতে একদিন উধাও হয়ে গেল। ও কী যেন ব্যবসা করতে চেয়েছিল। করা হয়নি। ও তো আর ব্যবসা করবে না। কেন?

বিদুষী কত কথা বলেছিল, কিন্তু রাখেনি একটাও। অন্যের বুকে এখন মাথা রেখে স্বপ্ন জাগায়। কারণ কী?

জীবনের সবকিছুই তো শেষ। বাকি এখন একরাশ মলিন অতীত। সেই তো লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে অদ্ভুত এক শঙ্কিত আঁধার। আর বিমূর্ত ছেলেটি। অতঃপর সেই এক সিদ্ধান্ত, মধ্যবিত্ত রক্তের ঝাপসা কষ্টের আবেগ-জাগানিয়া সিদ্ধান্ত। জ্যোৎস্নাভরা রাত, মাঝির গান, শিশিরভেজা ঘাস, নদীর মৃদু ঢেউ—সব আজ ম্লান।

কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে ছেলেটি। অদ্ভুত ভঙ্গিতে ছড়িয়ে দেয় বাতাসে। দুলতে দুলতে টুকরোগুলো উড়ে যায়। এক সময় হারিয়ে যায় এখানে-ওখানে। এত বড় পৃথিবীকে মাঝেমধ্যে বড্ড ক্ষুদ্র মনে হয়। ম্লান চোখে ছেলেটা আবার সামনের দিকে তাকায়। ট্রেনটা এগিয়ে আসছে। দ্রুত...